দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

৫ সেপ্টেম্বর - ২০১১, ১৮ ভাদ্র - ১৪১৮ ।।
৬৪ বর্ষ, ৩ সংখ্যা

সংসদের দোহাই দিয়ে

আন্নার জন-আন্দোলন রোখা যাবে ?

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

বামফ্রন্ট প্রকৃত অর্থেই 'ভেঙে' গেছে ❑ ৮

গোঁড়া ধর্মীয় ইমামদের ফতোয়া নিয়ে সংবাদমাধ্যম নীরব ❑ ৯

আন্না হাজারের আন্দোলন : নীতি ও পদ্ধতি ❑ তথাগত রায় ❑ ১১

স্যাম বাহাদুরকে 'ভারতরত্ন' দেওয়া হোক ❑ অশোক কুমার মেহতা ❑ ১৩

আন্নার গ্রেপ্তার ইস্যুতে কংগ্রেসকে একশ'টি পেঁয়াজ ও একশ' ঘা বেত— দুটোই খেতে হলো ❑ সাধন কুমার পাল ❑ ১৪

আন্না হাজারের আন্দোলন ও জন-লোকপাল বিল ❑ রণজিৎ রায় ❑ ১৬

অসম সরকারের স্বীকারোক্তি : অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই ধস নেমেছে অর্থনীতিতে ❑ ১৯

খোলা চিঠি : দিদি, শেষে রবীন্দ্র-নজরুলকেও 'আমরা-ওরা' করে দিলেন? ❑ সুন্দর মৌলিক ❑ ২০

আমি রবীন্দ্রনাথ বলছি.... ❑ নটরাজ ভারতী ❑ ২১

ধর্ম ধর্ম খেলা ও এক পরমহংস ❑ অর্ণব নাগ ❑ ২৪

নারীর ক্ষমতায়ন ❑ প্রীতি বসু ❑ ২৭

মেসি ম্যাজিকে ভারতীয় ফুটবলের কি এল-গেল? ❑ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ১৮** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑

সু-স্বাস্থ্য : ২৬ ❑ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮** ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

আন্নার আন্দোলন ও জন-লোকপাল বিল — পৃঃ ১৪-১৬

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৮ ভাদ্র, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ৫ সেপ্টেম্বর - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

জনশক্তির জয়

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইতে অবশেষে দেশবাসীর জয় হইয়াছে। সংসদ রাজি হইয়াছে আন্না হাজারের দাবিগুলিকে মান্যতা দিতে। তবে আন্না হাজারেরা যে দাবিগুলি আজ তুলিয়াছেন তাহা বহুপূর্বেই সরকারের নিজেরই চালু করা উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের দেশের সাংসদেরা নিজেদের সুযোগ -সুবিধা পাইবার জন্য যতটা মাতামাতি করিয়া থাকেন, নিজেদের মধ্যে কলহ করিয়া যতটা ফাটাফাটি করিয়া থাকেন—ততটাই নিশ্চুপ থাকেন দুর্নীতির প্রশ্নে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইয়া তাহারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মান্যতা দিতে রাজি নন। তাই জনগণের প্রতিনিধি হইয়া রামদেব আন্না হাজারেদের বারে বারে আন্দোলন করিতে হয়। এই বৃদ্ধ বয়সে তাই আন্না হাজারেকেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইতেছে। সাংসদরা নিজেদের দায়িত্ব এড়াইয়া এতদিন এই বিষয়ে সচেষ্ট হন নাই। প্রধানমন্ত্রী নিজের সততা লইয়া বারে বারে বড়াই করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারই তো দায়িত্ব ছিল এ বিষয়ে পূর্বেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেষ্ট হওয়া এবং কঠোর লোকপাল বিল সংসদে পেশ করা। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন নাই। আন্না হাজারেকে তাই এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আন্দোলনের পথে যাইতে হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী এবং সাংসদদের অসমাপ্ত কাজ আন্না শুরু করিয়াছেন। ইহাতে সংবিধানের মর্যাদা, সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার কি কারণ ঘটিয়াছে? সংবিধানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লইবার ক্ষমতা সংসদকে দিয়াছে। কিন্তু সংসদ সেই দায়িত্ব পালন করেন নাই। কারণ সাংসদদের একাংশ নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত এবং সরকার সেই দুর্নীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাহাদের পক্ষে দুর্নীতির প্রশ্নে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা সম্ভব কি? প্রশ্ন উঠিয়াছে, আন্না হাজারের দাবিগুলি সরকার মানিয়া লইলেই কি দেশ হইতে দুর্নীতি দূর হইবে? একথা ঠিক— প্রশাসন সচেষ্ট না হইলে দুর্নীতি নির্মূল হইবে না। এতদিন প্রশাসন দুর্নীতির প্রশ্নে নিশ্চুপ ছিল। আন্না হাজারের আন্দোলনের ফলে প্রশাসন এ বিষয়ে চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইলেই জনপ্রতিনিধিদের সমস্ত অন্যায় অপকর্ম সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পায় না, প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন হইলেই তাহার সমস্ত অন্যায় করিবার অধিকার জন্মায় না। সংসদীয় গণতন্ত্র বিপন্ন বলিয়া রাজনীতিকরা যতই দুর্নীতিকে আড়াল করিবার কৌশল লইবে, ততই সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। মানুষ মনে করিবে সংসদই দুর্নীতিবাজদের মূল কেন্দ্র।

মূলত সংসদের মর্যাদা বহু পূর্বেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সাংসদদের আচার আচরণের জন্য। গণতন্ত্রের পীঠস্থানে যে অভব্যতা চলিয়া আসিতেছে তাহা কি সত্যিই গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ লক্ষণ! আন্না হাজারে এই জন্যই সংসদের ভিতরে সাংসদদের ভাষণ ও ভোটদানও যাহাতে দুর্নীতিমুক্ত হয় সেটিও লোকপালের আওতায় নিয়ে আসিবার দাবি জানাইয়াছেন। রাজনীতিকরা এই দাবি মানিতে কেন প্রস্তুত নয় তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এই দাবি না মানা হইলেই সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। জনসাধারণ ঘৃণার দৃষ্টিতে সাংসদদের দেখিবে। বলা হইতেছে সংসদই আইন প্রণয়ণ করিয়া সব কিছু ঠিক করিবে। ঘটনা হইল সেই দায়িত্ব পালনে সংসদ ব্যর্থ হইয়াছে বলিলাই তো আন্না হাজারে আন্দোলনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা সাংসদদেরই অপদার্থতার নমুনা। এই আন্দোলন বরঞ্চ গণতন্ত্রে নতুন মাত্রা যোগ করিয়াছে। আন্না হাজারের আন্দোলন প্রমাণ করিয়াছে সংসদের বাইরেও জনসমাজের বক্তব্যকে স্থান দেওয়া এবং তাহার সমাদর করাই প্রকৃত গণতন্ত্র। আর এস এসও এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। আর এস এস মনে করে মতাদর্শের কারণেই তাহারা আন্নার লড়াইতে সামিল হইয়াছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াইটাই এক্ষেত্রে বড় কথা। সমাজের দাবীই মুখ্য, রাজনীতির লাভ-ক্ষতিটা গৌণ। আপাতত এই আন্দোলন সরকারের নিকট একটি অগ্নিপরীক্ষার ন্যায় উপস্থিত। দুর্নীতিকে নির্মূল করিয়া সংসদ তথা সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করিবার দায়িত্ব এখন সরকারের। আন্নার এই আন্দোলন সমাজের সব শ্রেণীরই মানুষকেই সচেতন করিয়াছে। রাজপথের আন্দোলন আসিয়া মিলিত হইয়াছে সংসদীয় বিতর্কে। জনশক্তির জয় ঘোষিত হইয়াছে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতি প্রচলিত পদ্ধতিগুলির সঙ্গে আমার একটুও আত্মীয়তা নেই, যদিও ইউরোপে ওইগুলির ফল ভাল বলে লক্ষ্য করা গেছে। ভারতের নিজস্ব প্রকৃতি, পদ্ধতি ও স্বভাব আছে। তার প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের মৌলিক পথ অবলম্বন করতে হবে। আমাদের ইউরোপের পথ অনুসরণ করার কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োজন নেই। তার কারণ ওই দেশগুলি তো এই সেদিন মাত্র জন্মেছে আর নিজেদের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের অনুসরণ করলে সমাজকে হোঁচট খেতে হবে।

—ঋষি অরবিন্দ

ছিটমহলের ভারতীয়রা এখন নিজের দেশেই অনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ৬৪ বছর আগে একটি ভুলের যারা শিকার হয়েছিলেন, তাদের দুরবস্থার কথা এতদিন কেউ খেয়ালই করেনি। না রাজ্য-সরকার, না কেন্দ্র সরকার। সম্প্রতি অবশ্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। এই মানুষগুলি এখন পরিচিতির অভাবে ভুগছে। এখন তারা যদি নিজেদের ভারতীয় বলার অধিকার না পায়, তবে 'অবৈধ অভিবাসী' বলে চিহ্নিত হবে। অর্থাৎ নিজের মাতৃভূমিতেই অনাথ হয়ে থাকবে। এই স্বীকৃতি পেতেই তারা এখন স্থানীয় প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এইসব 'পরিচয়হীন' মানুষদের সংখ্যা ৩৫০০০-এরও বেশি হবে। এরা একসময় বাংলাদেশে থাকা ভারতের ছিটমহলগুলির বাসিন্দা ছিল। তাদের বক্তব্য— বাংলাদেশী সীমান্তরক্ষী বি ডি আর-এর স্বৈরাচার ও স্থানীয় মৌলবাদীদের অত্যাচারে তারা নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে চলে আসতে বাধ্য হয়। তারা ভেবেছিলেন ভারতে গেলে তাদের কষ্টের অবসান হবে। কিন্তু হয়েছে উল্টো। তাদের এই দুরবস্থার কথা সকলেই জানেন। কিন্তু তাদের সমস্যার কোনও সুরাহা হচ্ছে না।

তাদের এই ক্ষোভ আরও বেড়েছে সাম্প্রতিক জনগণনার সময়। কেন্দ্র সরকার ভারতের মধ্যে বাংলাদেশী ছিটমহলগুলির বাসিন্দাদেরও গণনা শুরু করছে। অথচ সরকার তাদের এই গণনার আওতায় আনতে চাইছে না কেননা তারা সরকারিভাবে 'অবৈধ অভিবাসী' (illegal immigrants)। ঘটনা হলো, এর ফলে বাংলাদেশী ছিটমহলের বাসিন্দারা ভারতীয় বলে গণ্য হয়ে গেল অথচ ভারতীয় হয়েও তাদের ভারতীয় হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার অধিকার থাকল না।

সরকারের এই নীতির প্রতিবাদে সম্প্রতি তারা 'দি ইন্ডিয়ান এনক্লেভ রিফিউজিস এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। সংগঠনের তরফে ২৫ আগস্ট ৪০০ জনের একটি প্রতিনিধিদল তাদের ভারতীয় হিসাবে গণ্য করার দাবীতে জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে।

সমিতির সম্পাদক ফলিন রায় হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন, স্যার র‍্যাডক্লিফ এবং তার বাউন্ডারি কমিশন বাংলা ভাগ করতে গিয়ে যে ভুল করেছেন, তার মাশুল তাদের আর কতদিন গুণতে হবে এটা তারা জানতে চায়। কুরিগ্রাম, লালমণিরহাট, নীলপাহমারি ও পঞ্চগড়—বাংলাদেশের এই চার জেলায় ভারতের ১১১টি ছিটমহলে প্রায় ২ লক্ষ লোক বসবাস করছেন। তাদের যদি এখন সুযোগ দেওয়া হয়, সম্ভবত তাদের সবাই ভারতের মূল ভূখণ্ডে বসবাস করতে চাইবে। বস্তুত তারা প্রায়ই অনুপ্রবেশ করে ভারতের দিকে সীমানা বরাবর এলাকায় পুনর্বাসনের দাবী জানিয়ে আসছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে ৫৫টি বাংলাদেশী ছিটমহল রয়েছে যেখানে ১ লক্ষেরও বেশি মানুষ বসবাস করে। মজার কথা হলো, তারা ভারতীয় নাগরিকত্বের সকল সুবিধা ভোগ করলেও এদেশে সরকারিভাবে কোনও জমির মালিক হতে পারে না। কেননা সরকারিভাবে ভারতীয় বলে তারা চিহ্নিত নয়। এই জনগণনাতে তাই তারা সকলেই ভারতে থাকতে চায়। ভারতীয় হিসেবে সরকারি পরিচিতি পত্র পেতে চায়।

মোঘল সাম্রাজ্য ও কোচ রাজাদের এক চুক্তি এই ছিটমহল সমস্যার উৎস। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর কোচবিহারের অন্তর্গত মোঘলদের এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে যায়। আবার ১৯৬২-তে কোচবিহার যখন ভারতের অঙ্গীভূত হলো, তখন ওইসব এলাকাও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো। আর এর ফলে সীমানা বরাবর ছিটমহল সমস্যার সৃষ্টি হয় যার মাশুল গুণতে হচ্ছে আজও।

আন্না হাজারের কয়েকজন সহযোগী সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় : সিংঘল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন যে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে তা অনুকরণযোগ্য। কিন্তু তাঁর কয়েকজন সহযোগী সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয় বলে সম্প্রতি হরিদ্বারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি অশোক সিংঘল। শ্রী হাজারের সঙ্গীদের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এন জি এ) চালিয়ে কোটিপতি হয়েছেন। তাদের প্রতি নজর রাখতে হবে বলে তিনি সতর্ক করেছেন। এছাড়া দিল্লীর রামলীলা ময়দান থেকে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে যেসব স্লোগান দেওয়া হয়েছে, এমনকী সংসদ সম্পর্কেও কটাক্ষ করা হয়েছে, তা অনুচিত বলে তিনি মনে করেন। উল্লেখ্য, আন্নার আন্দোলনে সহযোগী স্বামী অগ্নিবেশ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। রামলীলা ময়দানের মঞ্চ থেকে অভিনেতা ওমপুরীর সংসদ নিয়ে কটাক্ষও ভালো চোখে দেখেনি বলে শ্রী সিংঘল মনে করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ ধর্মযাত্রা মহাসঙ্ঘ এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর তিনি জানান। রামলীলা ময়দানে যোগদানকারীদের জন্য তারা ভোজনের ব্যবস্থা করেছে। জাতীয় বিপদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা হলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে একথাও তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন।

আই এস আইয়ের সক্রিয় মদত

আফগানিস্তানে হিকমাতায়ার গোষ্ঠীর 'টার্গেট' ভারতীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আফগানিস্তানে থাকা ভারতীয়দের লক্ষ্যবস্তু করতে আফগান-কেন্দ্রীক জঙ্গিসংগঠন আল-হুদার-এরপ্রকাশ্য শাখা গুলবুদ্দিন হিকমাতায়ারের গোষ্ঠীকে পেছন থেকে মদত দিতে হাতে হাত মিলিয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই এবং তালিবানেরা। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এই মর্মে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়ে সতর্ক করেছে কেন্দ্রকে। প্রসঙ্গত, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের উন্নয়ন ও পরিকাঠামো রূপায়ণ কর্মসূচীতে বহু ভারতীয় কোম্পানী যুক্ত রয়েছে। সেই কোম্পানীগুলিতে কর্মরত ভারতীয়রা ছাড়াও ব্যবসাসূত্রে বহু এদেশীয় সেখানে বসবাস করেন। 'র' তার পাঠানো রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, আই এস আই-এর মদতপুষ্ট জঙ্গিরা বহুদিন ধরেই ভারতীয় সম্পত্তিগুলিকে 'টার্গেট' করেছে।

সেই রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারত-বিরোধী অপারেশন চালাতে আল হুদাকে অর্থ সাহায্য, প্রশিক্ষণ ও আশ্রয় দেওয়া থেকে শুরু করে প্রশিক্ষিত কর্মী সংগ্রহের ব্যাপারেও পূর্ণ সহযোগিতা করছে আই এস আই। গোয়েন্দা সূত্র জানাচ্ছে, দু'টি প্রশিক্ষণ-শিবির ইতিমধ্যেই আয়োজন করেছে আই এস আই দক্ষিণ আফগানিস্তানের চুনার এবং নুরিস্তানের পার্বত্য এলাকায়। এই চুনার ও নুরিস্তান দু'টো এলাকাই অবিসংবাদিতভাবে হিকমাতায়ার গোষ্ঠীর দখলে এবং অতি সাম্প্রতিক অতীতে ন্যাটো বাহিনীকেও এই অঞ্চলে অপারেশন চালাতে হিকমাতায়ার গোষ্ঠীর প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ল্যান্ডমাইন ওড়ানো এবং বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি দিয়ে সম্পত্তি ধ্বংস করতে এই হিকমাতায়ার গোষ্ঠী সিদ্ধহস্ত।

আফগানিস্তানের রাস্তা, সেতু, হাসপাতাল, সরকারি ভবন এবং সেদেশের সংসদ ভবন তৈরি সহ ৩০০-রও বেশি উন্নয়ন প্যাকেজে অর্থ সাহায্য করছে ভারত। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জাতিকে ঘুরে দাঁড়াবার জন্য তাদের বাজেটে ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি আর্থিক অনুদান রয়েছে ভারতের। নির্মাণ-ইঞ্জিনিয়ার, তাদের সাপোর্টিং স্টাফ এবং ভারত-তিব্বত সীমান্তে প্রহরারত ভারতীয় জওয়ানরা যেমন এই চলতি উন্নয়ন-প্রকল্পে সহযোগী, তেমনি আফগানিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ২৪টি কনস্যুলেট এবং কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসে কর্মরত বহু ভারতীয়ও সেই উন্নয়ন কর্মসূচীর অংশীদার। তাই এদের প্রত্যেকেই আই এস আই তথা হিকমাতায়ার গোষ্ঠীর 'টার্গেট' বলে 'র'-এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, 'র'-এর রিপোর্ট হাতে আসার পরই ভারতীয় দূতাবাস সহ কনস্যুলেট, সর্বোপরি ভারতীয়দের নিরাপত্তা আটোসাঁটো করা হচ্ছে। 'ফিদায়েন (আত্মঘাতী) আক্রমণ' অথবা গাড়ি বোঝাই বিস্ফোরক হানা থেকে রেহাই পেতে সেই সমস্ত ভবনগুলি থেকে বেশ ভালোরকম দূরত্ব রেখে পেরিমিটারের সাহায্যে বহিরাগত ব্যক্তি ও গাড়ির পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০০৯-এর ৮ অক্টোবর কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসে হানা দিয়ে তালিবানরা ১৭ জনকে হত্যা করে ও এই ঘটনায় ৬৩ জন আহত হন। ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে তাদের 'কর্মক্ষেত্রে' আক্রমণ করার ঘটনাও ইতিপূর্বে বহুবার ঘটিয়েছে তালিবানরা। আমেরিকা যুদ্ধ-দাঙ্গা বিধ্বস্ত আফগানিস্তান থেকে ধাপে ধাপে সেনা প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গেই আই এস আই ক্রমশ তার জাল বিস্তার করতে থাকে এখানে। যার পেছনে পাক-সেনাবাহিনীর পুরো মদত রয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে।

হিকমাতায়ার-পাকিস্তানের অশুভ আঁতাত

● 'র'-এর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, আফগানিস্তানে থাকা ভারতীয়দের ওপর আক্রমণ চালাতে আল-হুদা-কে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য, প্রশিক্ষণ এবং আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি, সেখানকার ভারতীয়দের গতিবিধির ওপরও পূর্ণ নজরদারি চালাচ্ছে পাক-গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই।

● মুসলিম যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আই এস আই দু'টি প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করে—দক্ষিণ আফগানিস্তানের চুনার এবং পাক-আফগান সীমান্তের পার্বত্য এলাকা নুরিস্তানে।

● আফগানিস্তানের ভারতীয় এমব্যাসী ও কনস্যুলেটগুলিতে এই মর্মে উচ্চ-সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এবং এগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখে তা আরও আঁটোসাঁটো করার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর।

স্বস্তিকা'র বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য জরুরী বিজ্ঞপ্তি

(এজেন্ট ও ডাক মারফত প্রাপ্ত সকল গ্রাহকদের জন্য)

যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের গ্রাহক মেয়াদ ৩১শে আগষ্ট '১১ শেষ হবে এবং যাদের গ্রাহক মেয়াদ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনুগ্রহ করে আপনার গ্রাহকপদ নবীকরণ করুন। ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে নবীকরণের টাকা স্বস্তিকা দপ্তরে জমা না পড়লে আগামী পূজা সংখ্যা (৩.১০.১১) থেকে তাঁদের স্বস্তিকা পাঠানো সম্ভব হবে না।

টাকা চেক, ব্যাঙ্ক ড্রাফ অথবা মানি অর্ডার করে পাঠাবেন। চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট Swastika -এই নামে A/c. Payee করে পাঠাবেন। পাঠানোর ঠিকানা— কার্যাধ্যক্ষ, স্বস্তিকা, ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৬।

সবক্ষেত্রে অবশ্যই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। **—কার্যাধ্যক্ষ, স্বস্তিকা**

বামফ্রন্ট প্রকৃত অর্থেই 'ভেঙে' গেছে

নিশাকর সোম

রাজ্য-রাজনীতি সম্পর্কে প্রবীণতম বামপন্থী তথা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ বলেছেন, ''রাজ্যে আগেই সঙ্কটজনক অবস্থা ছিল— এখনও আছে। অতীতের বহু ঘটনাতে আমরা বাধা দিতে পারিনি। বিপর্যয়ের জন্য বড় পার্টিই দায়ী।''

পরাজিত মন্ত্রী আর এস পি-র কার্যকরী রাজ্য সম্পাদক ক্ষিতি গোস্বামী বলেছেন,— ''বামফ্রন্টে ঘূণ পোকা ধরেছ।'' তিনি ইঙ্গিত করেছেন এই ঘূণ পোকা হলো বুদ্ধদেববাবু। ক্ষিতিবাবু আরও বলেছেন, ''বুদ্ধবাবু বামফ্রন্টকে যখন কুড়ুল দিয়ে ভাঙছিলেন, তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি শোনেননি। কোর-কমিটির সভা ডাকেননি। বুদ্ধবাবু দাম্ভিকতার জন্য বৃটিশের তৈরি জমি-আইন কাজে লাগিয়ে জমি দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কৃষকরা বিরুদ্ধে গেল। এর ফলে বামপন্থী জমি আন্দোলনের বুনিয়াদেই ঘা পড়লো। নন্দীগ্রামের ঘটনায় সাধারণ মানুষ বিরুদ্ধে গেলেন। ৩৪ বছরের মধ্যে ছাত্র-যুবকদের জন্য কিছু না করার জন্য তাঁরা ভাবলেন— সরকার বদল হলে সমাধান হবে— কিছু পাওয়া যাবে। তাই ছাত্র-যুব-কৃষক-শ্রমিক বিরুদ্ধে চলে গেল— শুধুমাত্র সিপিএম নেতৃত্বের একগুঁয়েমি এবং নীতি-বিচ্যুতির ফলে। এর মাশুল দিতে হচ্ছে।'' বামফ্রন্টের পরাজিত মন্ত্রী কিরণময় নন্দ বলেছেন, ''সিপিএম আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। রায়গঞ্জে হাসপাতালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জমি চেয়েছিল। বুদ্ধবাবুরা জমি দেওয়া যাবে না— এই মর্মে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি প্রচার করে আমাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রচার করা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার এর বিরোধী।''

এরই পাশাপাশি সিপিএমের বর্ধিত রাজ্য-কমিটির দু'দিনের অধিবেশনে ৪০ জন সদস্য বক্তব্য রেখেছেন। তার মধ্যে সব থেকে তীব্র সমালোচনা এসেছে মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী, দুই ২৪ পরগণার বক্তাদের কাছ থেকে। সমালোচনায় বিদ্ধ করা হয়েছে— বুদ্ধ-বিমান-নিরুপমকে। সবথেকে লক্ষণীয় বিষয় হলো— বর্ধমানে জেলার সদস্যগণ নিরুপমকে ছেড়ে কথা বলেননি, তাই নিরুপম একেবারেই বর্ধমান ত্যাগ করে সল্টলেকবাসী হয়েছেন।

দার্জিলিং-এর সদস্যদের বক্তব্য হলো— ''দার্জিলিং সমস্যা নিয়ে পার্টি নেতৃত্ব কখনও গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি। ফলে পাহাড় থেকে সিপিএম অপসৃত হয়েছে এবং তা পার্টি নেতৃত্বের দোষেই। সমালোচনায় ভুল শিল্পনীতি, ব্যর্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ইত্যাদির মোট ফল পার্টির বিপর্যয়। রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসু তাঁর জবাবি ভাষণে মেনে নিয়েছেন সমালোচনাগুলি। বুদ্ধবাবু ছ'য়ের দশকের মতো আন্দোলন করার উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধবাবুকে কোনও জেলাই আর পছন্দ করছে না।

বস্তুত বামফ্রন্ট যে ভেঙে গেছে তার নজির হলো রাজ্যপালের কাছে বামফ্রন্টের ডেপুটেশনে আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক বা সিপিআই-এর প্রতিনিধিরা ছিলেন না। আরও মজার ঘটনা হলো বামফ্রন্টের ডেপুটেশনে রাজ্যপালের নিকট সন্ত্রাস নিয়ে একটি শব্দ খরচ করা হয়নি!

দিল্লিতে সংসদের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের

কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের জন্য সিপিএমের রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসু গিয়েছেন আপাতদৃষ্টিতে একথাই মনে হয়। কিন্তু তাঁকে নিয়ে সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট এবং সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন এক বৈঠকে বসেন। সেখানে এ রাজ্যের পরিস্থিতি— কঙ্কাল কাণ্ড নিয়ে তারা প্রশ্ন করে বিমানবাবুকে জেরবার করে দিয়েছেন। এ বি বর্ধন বলেছেন, ''পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের পরিচালিত সরকারের ৩৫ বছরের কার্যকলাপ সারা ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষতি করেছে।'' কঙ্কাল কাণ্ড নিয়ে মমতা-সরকারের পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছেন কিরণময় নন্দ। কিরণময় নন্দ নাকি বিমান-ভক্ত ছিলেন? ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই, আর এস পি বামফ্রন্টে কঙ্কালকাণ্ড নিয়ে আলোচনার দাবি করেছে। কঙ্কালকাণ্ড সিপিএম-কে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কঙ্কালে পরিণত করেছে। তাই একাধিক লোকাল- কমিটি ও ব্রাঞ্চ কমিটি ভেঙে একটি করা হচ্ছে। বহু জেলায় লোকাল কমিটির সম্মেলন হবার মতো সদস্য উপস্থিত হচ্ছে না। সিপিএমের সাধারণ-সদস্যগণ পার্টি সম্মেলন নিয়ে উৎসাহিত নন। কারণ তাঁরা জানেন নেতৃত্বের চাপানো রাজনীতি কমিটিতে গৃহীত করার কৌশল নেওয়া হবে।

পার্টির সাধারণ সদস্যদের মধ্যে দু'টি মত— দীপক সরকার, সুশান্ত ঘোষ, গৌতম দেব-এর নীতিই সঠিক ছিল। অপরদিকে দীপক-সুশান্ত- তরুণ রায়-এর নীতি এবং গৌতম দেবের বোকামি পার্টির সর্বনাশের শেষ অগ্নিসংযোগ। এই দুই নীতির মতভেদের ফলে সিপিএম পার্টি ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। বিশেষ করে সুশান্ত বিপুল টাকা এবং তাঁর ডাইরির বক্তব্য রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনে সিপিএমের বিরুদ্ধে ঘৃণা সঞ্চার করছে। পাপের ফল পেতেই হবে।

এবার দেখা যাক, সরকারি দলের রাজনৈতিক অবস্থান। মুখ্যমন্ত্রীর যে বক্তব্যটি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তা'হলো— ''মূল্য বৃদ্ধির জন্য আমাকে বলা হচ্ছে কেন? আমার কোনও দায়িত্ব নেই। কেন্দ্রীয় সরকার দেখছে।'' মন্ত্রী অরূপ রায় এই বক্তব্য বহু আগেই বলেছিলেন, ''তরিতরকারির মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে রাজ্য-সরকারের কিছুই করণীয় নেই।'' মানুষ তো বামফ্রন্টের আমলে তৃণমূলের সঠিক সমালোচনা ও আন্দোলন ভুলে যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কাজের চেক-আপ করে গতি নির্দেশ করার জন্য টাউন হলে মন্ত্রী, সচিব, মুখ্য সচিবদের সভা করে একাধিক মন্ত্রীর কাজের সমালোচনা করেছেন। কোনও কোনও মন্ত্রী সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। সভায় কলকাতার মেয়র শোভন চ্যাটার্জি উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার মেয়রের উপস্থিতি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কলকাতার সঙ্গে সংযোগ রেখেই উন্নয়নের কাজ হবে। এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের বলেছেন, ''প্রাপ্ত অর্থের হিসাব দিলেই, তবে নতুন করে অর্থ বরাদ্দ হবে।'' রাজ্যের আর্থিক ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এ-ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির সঙ্গে কো-অর্ডিনেট করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী মুকুল রায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী পথ-অবরোধ, অবস্থান এবং বন্ধ-এর বিরোধী আইন আনতে চাইছেন! শ্রমমন্ত্রী ধর্মঘট এবং ইউনিয়নবাজি রোধ করার আইন আনার কথা বলেছেন। টাউন হলের সভায় দেখা গেল যে জনশিক্ষা দপ্তরের কোনও সচিব নেই। মুখ্যমন্ত্রী আদেশ দিলেন— ''উচ্চশিক্ষা সচিব এটা দেখবেন।'' মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, তাঁদের ৯০ দিনের শাসনে ৭৯ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তিনি আরও জানালেন, বামফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য কিছুই করেনি। তাঁর সরকার ৫০ হাজার নার্স-এর চাকরির ব্যবস্থা করবে। কলকাতা পুরসভা ৪০০ কোটি টাকার ওভার ড্রাফট নিচ্ছে। বর্তমান সরকার সম্পর্কে কোনও মন্তব্য ছাড়াই তাঁদের কাজকর্ম, মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের বক্তব্য হাজির করলাম— পাঠকগণ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবেন।

গোঁড়া ধর্মীয় ইমামদের ফতোয়া নিয়ে সংবাদ মাধ্যম নীরব

গূঢ়পুরুষের
কলম

অনশন সত্যাগ্রহকে হাতিয়ার করে আন্না হাজারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়নে কেন্দ্রের কংগ্রেস জোট সরকারকে বাধ্য করেছেন। কিন্তু এমন সাফল্য অতীতে বহু প্রতিবাদী মানুষ পাননি। অনশনেই তাঁদের মূল্যবান জীবন ঝরে গেছে। কারণ, একবার অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করলে দাবি না মেটা পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে ৬৪ দিন টানা অনশন সত্যাগ্রহ চালিয়ে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন অমর শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাস। তিনি জানতেন, দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের দাবি বৃটিশ সরকার মানবে না। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তিনি জেলে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করেছিলেন। এ এক আগুন নিয়ে খেলা। যে আগুন একদা মানবজাতিকে সভ্যতার পথে এগিয়ে দিয়েছিল, সেই আগুনই গ্রাস করেছে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে যেখানে অনশন সত্যাগ্রহী প্রাণ হারিয়েছেন। ১৯৬৯ সালের ২৭ অক্টোবর হরিয়ানার সমাজসেবী দর্শন সিং ফেরুমন চণ্ডীগড়কে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্তি না করার দাবিতে অমৃতসর জেলে ৭৪ দিন অনশন সত্যাগ্রহ চালিয়ে মারা যান। সম্প্রতি গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করার দাবিতে দীর্ঘকাল অনশনে থেকে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন স্বামী নিগমানন্দ। দক্ষিণ ভারতের নেতা পট্টি শ্রীরামালু জেলে বন্দি থাকাকালে ৫৮ দিন অনশন সত্যাগ্রহ চালিয়ে ১৯৫২ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রাণ হারান। সম্ভবত, স্বাধীনতাত্তোর ভারতে এটিই অনশন সত্যাগ্রহীর প্রথম মৃত্যুর ঘটনা। আন্না হাজারে দিল্লীর রামলীলা ময়দানে অনশন সত্যাগ্রহ চালিয়ে সফল হয়েছেন। সরকার নতজানু হয়েছে। দুর্নীতিকে আড়াল করার সাহস পায়নি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন আন্নাকে জিতিয়েছে। কিন্তু মণিপুরের বিদ্রোহিনী কন্যা ইরম শর্মিলা চানু সফল হননি। আজও তিনি হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে নীরবে অনশন সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছেন। শর্মিলার দাবি, মণিপুরে যে কোনও ব্যক্তিকে বিনা প্রশ্নে গুলি করে হত্যা করার বিশেষ অধিকার সামরিক বাহিনীকে দেওয়া যাবে না। কারণ, তাঁর অভিযোগ এই বিশেষ অধিকারের অপপ্রয়োগে সেখানে বহু নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। নিহত মানুষের পরিবার বিচার পায়নি। কারণ, এই বিশেষ সামরিক আইনে সেনার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একদা নন্দীগ্রামে পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং সিঙ্গুরে অনিচ্ছুক চাষীদের জমি ফেরৎ দেওয়ার দাবিতে কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে দীর্ঘকাল একক অনশন সত্যাগ্রহ চালিয়ে ছিলেন। আন্নার মতোই 'জনমত' তাঁকে দাবি আদায়ে সাহায্য করেছিল। তাই আমরণ অনশনে বসা সত্যাগ্রহীর দাবি আদায়ে সাফল্য বা অসাফল্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে জনসমর্থনের উপর। ব্যক্তি স্বার্থে অথবা ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থে অনশন সত্যাগ্রহ সফল হয় না। দেশের সকল মানুষের স্বার্থে, সমাজের কল্যাণে অনশন সত্যাগ্রহই সফল হয়। পরাধীন ভারতে দেশের সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনার প্রতিবাদে একাধিকবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, গান্ধীজী সাফল্যের সঙ্গে অনশন সত্যাগ্রহ করেছিলেন। অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অস্ত্র হিসাবে অনশন সত্যাগ্রহকে ব্যবহার করা একান্তই ভারতীয়। বলা ভালো, এই অহিংস প্রতিবাদ একান্তই হিন্দু ভারতের। ভারতীয় মুসলিম মানসিকতায় অহিংস অনশন সত্যাগ্রহের কোনও স্থান নেই। বৃটিশ ভারতের ২০০ বছরের ইতিহাসে অথবা স্বাধীনতাত্তোর ভারতের বিগত ৬৪ বছরে কোনও মুসলিম নেতা অনশনে প্রাণত্যাগ করেছেন এমন ঘটনা আমার জানা নেই। এমনকী সাম্প্রতিককালে আন্না হাজারের অনশন সত্যাগ্রহ মঞ্চে বা রামলীলা ময়দানে একজনও মুসলিম নেতা বা মৌলানা সমর্থন জানাতে যাননি। কারণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে অনশন সত্যাগ্রহকে মৌলানা-মৌলবিরা হিন্দু নীতি বলে মনে করেন। সরাসরি এই সত্য স্বীকার না করে ঘুরিয়ে এমন কথাই বলেছেন জামা মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারি। বলেছেন, আন্নার ধরনা মঞ্চে বন্দেমাতরম এবং ভারতমাতা কি জয় ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে। দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করা ইসলাম ধর্ম বিরোধী। ইসলামে মা-কে দেবীরূপে পূজা নিষিদ্ধ। ইসলামে মেয়েদের সন্তান প্রসবকারিণী যন্ত্র হিসাবে দেখা হয়। ইসলাম সম্পূর্ণভাবে পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম। পৃথিবীর তাবৎ বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে পুরুষের ভোগ তৃপ্তির জন্য। বুখারি বলেছেন, আন্নার আন্দোলন ইসলাম ধর্ম বিরোধী। তাই সাচ্চা মুসলমানরা আন্নাকে সমর্থন করতে পারেন না। বুখারি ফতোয়া দিয়েছেন, আন্নার আন্দোলন থেকে মুসলিমদের দূরে থাকার। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখতে পাই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায় যোগ দেয়নি। কারণ, আন্দোলনে যুক্ত মানুষজন 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে বৃটিশ রাজশক্তির লাঠিগুলির সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যতদূর জানি, সেই প্রথম বন্দেমাতরমকে ইসলাম ধর্ম বিরোধী বলে চিহ্নিত করা হয়। জামা মসজিদের শাহী ইমামকে দিল্লীর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, ভারতের মুসলমানরা কী দুর্নীতিকে দেশের উন্নয়নের প্রধান বাধা বলে মনে করেন না। ইমাম সাহেবের স্পষ্ট জবাব, দুর্নীতি নয়, গেরুয়া সন্ত্রাসই ভারতের উন্নয়নের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ হলেই দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে উন্নয়নের পথে জোর কদমে এগিয়ে যাবে। চমৎকার জবাব। গত ২১ আগস্ট বুখারি আন্নার আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, বুখারির এমন একটি সাম্প্রদায়িক ফতোয়া নিয়ে দেশের টি ভি সংবাদ চ্যানেলে বিতর্ক হতে দেখিনি। সংবাদমাধ্যমের এমন বিস্ময়কর নীরবতাই শাহী ইমামের মতো গোঁড়া ধর্মীয় নেতাদের দেশে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতে উৎসাহিত করে।

মুসলিম কারে কয়?

মুসলিম কারে কয়? সে কি কেবলই যাতনাময় (অন্তত হিন্দুদের কাছে)? এ কী বিষম সম্বাদ! কট্টর ইসলামী মৌলবাদী হিসেবে সুপরিচিত কেন্দ্রীয় সরকারের জামাই আদরে সরকারী অতিথিশালায় (অর্থাৎ কি না জেলখানায়) থাকা ২৬/১১ কাণ্ডের খলনায়ক আজমল কাসভ নাকি সদ্যসমাপ্ত রমজান মাসে রোজা রাখেননি। যাক্ বাবা, আজমলভাইয়ের পিত্তিটুকু অন্ততঃ পড়বে না— এই সংবাদে কেন্দ্র নিশ্চিন্তে আশ্বস্ত হতে পারে। কিন্তু মনোবিদদের চিন্তায় ফেলেছে, যে ইসলামের নামে ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর মুম্বাইয়ে মানুষ খুন করতে তার হাত কাঁপল না সেই ঐস্লামিক বিধি এক লহমায় সে ত্যাজ্য করল কোন সাহসে? যার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে কাফের নিধনে উৎসাহিত করতে ইসলামে যে বিধান রয়েছে তাই-ই তাকে প্ররোচিত করেছিল। ভারতবর্ষেও যার দায় মাদ্রাসা-মক্তবসমূহ ও মৌলবাদীরা এড়াতে পারেন না বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

২৫০০ জঙ্গির অনুপ্রবেশ

২৫০০ প্রশিক্ষিত জঙ্গি জম্মু-কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করতে প্রস্তুত বলে নিজেদের আশঙ্কার কথা জানিয়ে দিল কেন্দ্র সরকার। গত ২৪ আগস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং রাজ্যসভায় জানান, ''সীমা পেরিয়ে আড়াই হাজারের মতো কাশ্মীরী সশস্ত্র জঙ্গি জম্মু-কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করতে পুরোপুরি তৈরি বলে আমাদের কাছে গোয়েন্দা-রিপোর্ট রয়েছে।'' কিন্তু সেই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা খোলসা করেননি স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন শুধু আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেই দায় সেরেছে সরকার। কারণ কেন্দ্রের বিভ্রান্তিকর নীতিই যে কাশ্মীরী জঙ্গিদের এদেশে অনুপ্রবেশে উৎসাহিত করছে তা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

তাসের পুত্র অপহৃত

পাক-ভূমিতে তালিবানী সন্ত্রাস অব্যাহত। আজ্ঞে হ্যাঁ, ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর কয়েকমাস বাদেও। যার আরেকটি নিদর্শন দেখা গেল শাহ্বাজ তাসেরের অপহরণে। আট-ন মাস আগে ব্ল্যাসফেমী আইনের চরম বিরোধী ও উদারপন্থী হিসেবে সুপরিচিত পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের প্রাক্তন শাসক শাহবাজের বাবা সলমন তাসের খুন হন নিজের ইসলামিক কট্টরপন্থী দেহরক্ষীর হাতেই। শাহবাজের কনিষ্ঠ

ভাই শেহরাজ জানিয়েছে, তাদের পরিবার অনেকদিন ধরেই তালিবান ও চরমপন্থীদের কাছ থেকে হুমকি পেয়ে আসছিলেন। স্থানীয় প্রশাসন এ নিয়ে নীরবই ছিল বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। এরাই শাহবাজ তাসেরের অপহরণের পেছনে রয়েছে বলে তাসের পরিবারের অভিযোগ। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, লাহোরের নিকটবর্তী একটি জনবিরল এলাকা থেকে চারজন সশস্ত্র দুষ্কৃতী তুলে নিয়ে যায় শাহবাজ-কে। শাহবাজের প্রাণ সংশয়ের পাশাপাশি সংশয়াতীত ভাবেই প্রমাণিত হচ্ছে, যে কোনও মুহূর্তে দেশটির (পড়ুন পাকিস্তানের) দখল নিতে পারে তালিবানরা।

বিপদের নাম চীন

সূর্য পুব দিকে ওঠার মতোই সাম্প্রতিক ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে এদেশবাসীর কাছে 'বিপদের নাম চীন' আপাতত একটি শাশ্বত উক্তিতে পরিণত হয়েছে। যার আধুনিকতম নির্দশন মিলল, ভারত সীমান্ত ঘেঁষে চীনের অত্যাধুনিক কঠিন-দাহ্য পদার্থের নিউক্লিয়ার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন সি এস এস ৫ এম আর বি এম মিসাইল স্থাপনে। চীনের কূটনৈতিক মহল সূত্রের খবর, 'অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স' সূত্র মেনে 'ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করার ভঙ্গিমা'য় (ডেটারেন্ট পশ্চার) ওই মিসাইল স্থাপনই ছিল চীনের মূল লক্ষ্য। পেন্টাগন চীন-কে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, উভয়পক্ষের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এরপর অবিশ্বাস আর অনাস্থা আরও বেশি করে জাঁকিয়ে বসবে।

আন্নার ছড়াছড়ি

'আলো আমার আলো' ছবি-তে আঘাত পেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারানো এক নারীর চরিত্রে অদ্ভুত রকমের বড় গগলস পরিহিতা সুচিত্রা সেনকে মনে আছে? সুচিত্রা সেন বলে কথা! তাই মানসিক ভারসাম্যহীন নারীর চরিত্রে অভিনয়ের সঙ্গে মাননসই তাঁর সেই বিচ্ছিরি ধরনের গগলস পরা তৎকালীন সময়ে অনুকরণ-প্রিয় বাঙালী'র কাছে একটি আদ্যন্ত ফ্যাশন-ই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাঙালীর অনুকরণ-প্রিয়তা আপাতত আন্না ম্যানিয়ায় ছোঁয়াছে ভাইরাসের মতোই গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন বিহারের শুধু দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালেই জন্ম নেওয়া ১৮৫টি শিশুর নামকরণ হয়েছে আন্নার নামে। ঝাড়খণ্ডের রাজধানী শহর রাঁচীর একটি স্কুলের সব শিশুরাই আন্নার অনশন চলাকালীন স্কুল ড্রেস-ট্রেস জলাঞ্জলি দিয়ে অবিকল তাঁর মতো টুপি মাথায় দিয়ে ফতুয়া কিংবা পাঞ্জাবী ও পাজামা পরে স্কুল করেছে। এই শত-সহস্র আন্নাদের সানন্দে মেনে নিয়েছে স্কুল-কর্তৃপক্ষ।

ভিভিআইপিদের ধার-বাকি

দেশের ভি ভি আই পি বলে কথা। এদের আর ধার-বাকি থাকতে আছে না কি! থাকলেও তা শুনতে হয় না কি! এসব সাত-পাঁচ ভেবেই ভারতীয় বিমান-সংস্থা এয়ার-ইন্ডিয়া পিঠে বেঁধেছি কুলো, কানে দিয়েছি তুলো হয়েই ছিল। কিন্তু অর্থ বকেয়া বা পাওনা হলেও, তারও তো একটা পরিমাণ আছে! একে বিমানকর্মীদের 'ট্রাবল', তার ওপরে ভি ভি আই পি-দের 'ট্রাভেল'-এর লোকসানের গঞ্জনা আর সইতে না পেরে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর সরল স্বীকারোক্তি— ভিভিআইপিদের বিশেষ উড়ানের ব্যবস্থা করতে গিয়ে এয়ার-ইন্ডিয়ার বাকি পড়েছে ৩৫০ কোটি টাকা। সেই টাকা উদ্ধারের একটা প্রচেষ্টার কথা এয়ার- ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হলেও তা কতদূর ফলপ্রসু হবে এনিয়ে সন্দিহান খোদ বিমান-কর্তৃপক্ষই।

আন্না হাজারের আন্দোলন : নীতি ও পদ্ধতি

তথাগত রায়

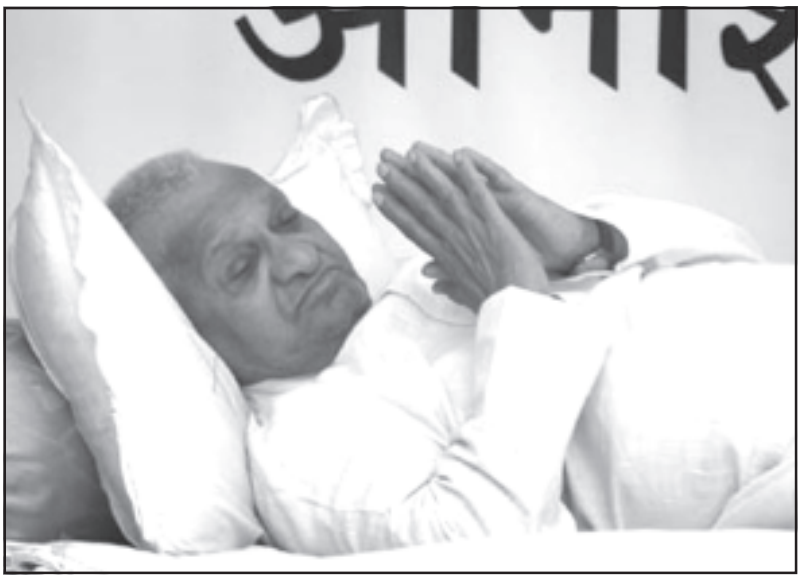

আন্না হাজারের আন্দোলনে আজকে সারা ভারত আন্দোলিত। গুয়াহাটি থেকে আমেদাবাদ, লুধিয়ানা থেকে তুতিকোরিন পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় আন্নার সঙ্গে সমন্বয় রেখে কেউ আলো নেভাচ্ছেন, কেউ নিজেরা অনশন করছেন, কেউ দিল্লীতে এসে আন্নার পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই লেখকের জনৈক বন্ধু, কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যন্ত উচ্চপদে, অর্থাৎ রেল বোর্ডের সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন, এস এম এস-এর মাধ্যমে বহু মানুষকে আন্দোলনে সামিল হতে বলছেন।

কিন্তু এরকম কি করে হলো? কয়েকমাস আগে পর্যন্তও আন্না হাজারের নাম গুজরাট মহারাষ্ট্রের বাইরের বেশিরভাগ মানুষ জানতেনই না— গুজরাট- মহারাষ্ট্রে তাঁর 'জনৈক বৃদ্ধ সমাজসেবী' ছাড়া অন্য কোনও পরিচয়ও ছিল না। দুর্নীতিও তো বহুকাল ধরে চলে আসছে, ট্রেনে আসন আরক্ষণ পাবার জন্য, গাড়ি চালাবার লাইসেন্স পাবার জন্য এবং অন্য নানাভাবে ন্যায্য এবং অন্যায় সুবিধা পাবার জন্য আমরা ঘুষ দিতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছি— কিছু ভাগ্যবান ঘুষ খেতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, আমরা তাদের ও তাদের পরিবারের আর্থিক রমরমা দেখেও অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তাহলে হঠাৎ কি ঘটল যে দেশশুদ্ধ লোক আন্নার আন্দোলনে সামিল হয়ে পড়ল?

এর সঙ্গে তাবৎ ভারতবাসীর মানসিকতার একটা প্রশ্ন কিন্তু জড়িয়ে আছে। ধৈর্য, তিতিক্ষা, দুর্ভাগ্যকে মেনে নেবার ক্ষমতা, এইসব গুণ পশ্চিমের মানুষের তুলনায় ভারতবাসীর অনেকগুণ বেশি, কিন্তু কোনও জিনিসেরই অতিরিক্ত ভাল নয়— আমরা যে ভাবে রাস্তায় জল জমা, ট্রেন দেরী করা এবং ন্যায্য কাজের জন্য (যেমন রেশন কার্ড) ঘুষ দেওয়া সহ্য করি সেটা না করলেই বোধ হয় ভাল ছিল। বস্তুতঃ, আমাদের ভারতীয়দের 'ইগনিশন পয়েন্ট' খুব উঁচুতে— যে তাপমানে পৌঁছলে কোনও দাহ্য পদার্থে আগুন ধরে যায় তাকে ইগনিশন পয়েন্ট বলে— ফলে আমাদের মনে সহজে আগুন ধরে না, অসীম সহ্যশক্তি দিয়ে আমরা তা মেনে নিই, 'নিয়তি' বলে ছেড়ে দিই। এটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পর্যন্ত পৌঁছেছে— আমাদের দেশে ক্রমাগত উগ্রপন্থী হানা হওয়া সত্ত্বেও আমরা যেরকম নির্বিকারভাবে, দু-একটা লোক দেখানো কথা বলে, দু'দিন বাদেই সব ভুলে যাই, তারই ফলে দেশে একের পর এক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটে চলে।

কিন্তু আমরা একেবারে অদাহ্য নই। কোনও না কোনও সময়ে, পাপের ভরা পূর্ণ হলে, আমরা ফুঁসে উঠি— যেমন বামফ্রন্টের স্বৈরাচার, খুন ও কুশাসনের বিরুদ্ধে আমরা করেছি— চৌত্রিশ বছর সময় লেগেছে মাত্র! স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকে বছর আট-নয় ছাড়া, কংগ্রেস দল যে ভারত শাসন করে আসছে, দুর্নীতির কালিমায় তারা ক্লেদাক্ত। ১৯৪৮ সালে কৃষ্ণ মেননের 'জীপ কেলেঙ্কারি' দিয়ে সম্ভবত এই দুর্নীতির শুরু। তারপর মাঝে মাঝে ব্যাপারটা তুঙ্গে উঠলে দু-একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা বলিপ্রদত্ত হয়েছেন— যেমন জীবন বীমা কর্পোরেশন— হরিদাস মুন্দ্রা ঘটিত কেলেঙ্কারিতে হয়েছিল টি টি কৃষ্ণমাচারী (১৯৬৫)। কিছু কিছু বড় দুর্নীতি চাপা পড়ে গেছে বা আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছে— যেমন বোফর্স, এইচ ডি ডব্লিউ সাবমেরিন, 'কুও' অয়েল ইত্যাদি। জরুরী অবস্থার সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রকাশ্যে বলেছিলেন, ''দুর্নীতি? সে তো পৃথিবীব্যাপী সমস্যা''! কংগ্রেস ছাড়া অন্য দলও এ ব্যাপারে নিষ্পাপ নয়। যদিও আমাদের পোড়া পশ্চিমবঙ্গের কমরেডরা তাঁদের রাজত্বকালে চুরির চাইতে খুন ব্যাপারটাতেই বেশি হাত পাকিয়েছিলেন, তা হলেও তাঁদের বড়বাবু নিজের সাতশো টাকা মাইনের করণিক পুত্রকে বহু কোটিপতি বানিয়ে গিয়েছেন, নিজের মরণাপন্ন শালাকে স্বাধীনতা সংগ্রামী সাজিয়ে তাঁর হাত দিয়ে তাঁর ভাগ্নেকে (অর্থাৎ নিজের পুত্রকে) সল্টলেকের জমি পাইয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এবার সম্ভবতঃ পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে, এবং আন্না হাজারে নামক স্বল্পখ্যাত এক সৎ সমাজসেবী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতিভূ হিসেবে উঠে এসেছেন। তাই আন্না হাজারের সপক্ষে ভারতের এত জায়গায় এত প্রদর্শন হচ্ছে এবং এত মানুষ এতে সামিল হচ্ছেন। এই আগুনে অবশ্যই ঘি ঢেলেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার— যাদের দেখে রণেন সেন কথিত 'হেড্‌লেস চিকেন', মাথাকাটা মুরগী বলতে ইচ্ছে হয়। এইরকম দিশেহারা, ল্যাজেগোবরে, অব্যবস্থিতচিত্ত সরকার কদাচিৎ দেখা যায়—এই আন্নাকে গ্রেপ্তার করছে, এই ছেড়ে দিচ্ছে, এই জেল ছেড়ে চলে যাবার জন্য কাকুতিমিনতি করছে। এর মধ্যে কংগ্রেসের স্বনামধন্য মুখপাত্র মনীশ তেওয়ারী আন্নাকে 'অসৎ' বলে এবং রশিদ আলভি এর পিছনে 'মার্কিন ষড়যন্ত্র' দেখে নিজেদের ও দলের মুখে আরও চুনকালি

মাখিয়েছেন।

শুধু জনসমর্থনের ব্যপকতা দেখেও এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই পৌঁছনো যায় যে আন্নার আন্দোলন নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য, নীতিগতভাবে তো বটেই। কিন্তু এর মধ্যেও কিছু মানুষ একটু উল্টো গাইছেন। তার মধ্যে সরকারী লোকেরা, যেমন প্রধানমন্ত্রী কপিল সিব্বল ইত্যাদি আছেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু এমন লোক আছেন যারা মোটেই কংগ্রেস সমর্থক নন, এবং যাঁদের সততা প্রশ্নাতীত, যেমন দিল্লীর সাংবাদিক তভ্লীন সিং, কাঞ্চন গুপ্ত প্রমুখ। এঁরা কেন এই আন্দোলন সমর্থক করছেন না সেটাও ভাল করে বোঝা প্রয়োজন।

এঁদের আপত্তি মূলত পদ্ধতিগত। আন্না হাজারে যে আন্দোলনটা করছেন সেটা নির্ভেজাল রাজনৈতিক আন্দোলন। যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সরকারকে দুর্নীতির প্রশ্নে নাড়া দেওয়া, জনলোকপাল প্রতিষ্ঠা করা সেটা রাজনৈতিক নয় তো আবার কি? এখন রাজনীতি ব্যাপারটা রাজনীতির মতো করেই করতে হবে, রাজনীতির মানুষকে দিয়েই করতে হবে— না হলে অপটু হাতে করা কাজ পণ্ড হতে বাধ্য। আন্না রাজনীতির মানুষ নন, তাঁকে যাঁরা সমর্থন করছেন তাঁরা অনেকেই বলছেন, 'রাজনীতিওয়ালে শালালোগ সব চোর হ্যায়', আন্না নির্বাচনেও দাঁড়াতে চান না। এই পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা কোন দিকে যাচ্ছে?

ধরে নেওয়া যাক্ আন্নার দাবী সরকার মেনে নিল, লোকপাল বিলের মধ্যে আন্নার যা যা বক্তব্য আছে সব ঢুকিয়ে নিল। কিন্তু বিল হলেই তো হবে না, সেটাকে সংসদে পাশ করিয়ে আইনে পরিণত করতে হবে। এখন, আন্নার বহু সমর্থকের কথা অনুযায়ী, যদি সংসদের ''শালালোক চোর হ্যায়'', তা হলে তারা সেই বিল পাশ হতে দেবে কেন? তারা সেটাকে নিয়ে অনন্তকাল আলোচনা করবে, সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবে, নানা ভাবে বিলটাকে লাট খাওয়াবে। তখন আন্না কি করবেন? তিনি তো সংসদের ভিতরে গিয়ে কিছু বলতে পারবেন না! তখন কি তিনি আবার অনশনে বসবেন? এতদিন জনসমর্থন টিকিয়ে রাখতে পারবেন?

তাই বক্তব্য, যদি রাজনৈতিক জীবন থেকে দুর্নীতি দূর করতে হয় তাহলে সংসদে বিধানসভায় ঢুকেই তা করতে হবে। সংসদের বাইরে আন্দোলনের নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা আছে কিন্তু সেটা সহায়ক ভূমিকা মাত্র। ওঁরা যে জনমত তৈরি করবেন তার ভিত্তিতে বিল তৈরি হবে, আইনে পরিণত হবে— তবেই কাজ কিছু এগোবে। তার জন্য সৎ, শুভচিন্তাসম্পন্ন, স্বার্থহীন মানুষকে রাজনীতিতে আসতে হবে, ভোটে লড়তে হবে, রাজনীতি শিখতে হবে। বাইরে থেকে রাজনীতিকদের বাপান্ত করে, বাঁধা মোটা মাইনের চাকরি নিয়ে পড়ে থাকলে, দুর্নীতি দূর হবে না।

একথাও ভাবা উচিত নয় যে জনলোকপাল একটি সর্বরোগহর বটিকা, জনলোকপাল হলেই দেশের সব দুর্নীতি ভ্যানিশ্ করবে। যাদের আদলে জনলোকপাল ভাবা হয়েছে, সেই ওমবুডসম্যান পদটির যে সব দেশে উৎপত্তি, তাদের জনসংখ্যা ভারতের মাত্র এক একটা জেলার সমান। ভারতে ১২৬ কোটি লোকের নালিশ তো একা জনলোকপাল শুনতে পারবেন না— তাঁকেও অফিস তৈরি করতে হবে, সেই অফিসে উচ্চপদস্থ সহায়ক থেকে আরম্ভ করে করণিক, বেয়ারা, ড্রাইভার প্রমুখ প্রচুর কর্মী থাকবেন। তাঁরা জনলোকপালের কাছে ফাইল পাঠাবেন, পুরোদস্তুর সরকারী অফিসের মতোই কাজ হবে। জনলোকপাল নিজে যতই সৎ লোক হন, এইসব অধস্তন কর্মচারীরা সবাই সৎ হবেন এমন গ্যারান্টি কি কেউ দিতে পারে? যদি তাঁরা তা না হন তা হলে তাঁরা জনলোকপালকে বিভ্রান্ত করে দেবেন, জনলোকপাল ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন।

তাই, আন্নার এই আন্দোলন স্বচ্ছ এবং নিরাবেগ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। নীতিগতভাবে আন্দোলনের সমর্থনযোগ্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না, কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে এই আন্দোলন আমাদের কোথায় পৌঁছে দেবে তা ভাবারও প্রয়োজন আছে। মনে রাখতে হবে, যদি এই আন্দোলন নিষ্ফল হয় তা হলে দুর্নীতিবাজরা আরও উৎসাহ পাবে। তাই সৎ, নিঃস্বার্থ লোকের রাজনীতিতে আসার কোনও বিকল্প নেই। রাজনীতির বাইরে থেকে কোনও কিছুই করা যাবে না।

স্যাম বাহাদুরকে ‘ভারতরত্ন’ দেওয়া হোক

অতিথি কলম

অশোক কুমার মেহতা

প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসে সেনাদের বীরত্বের কথা ঘটা করে বলা হয়। কিন্তু ফৌজ যেভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে দেশরক্ষার দায়িত্ব পালন করে তা কি যথাযথ মর্যাদায় স্মরণ করা হয়? হয় না। যোদ্ধাদের অবদান খুব সহজেই ভুলে যায়।

অন্যদিকে ক্রিকেটারদের দেশের মানুষ প্রতিদিনই মনে রাখে। অঘোষিত ভাবে ক্রিকেট এখন জাতীয় খেলা। খেলোয়াড়রাই যেন দেশের আদর্শ মানুষ। মন্ত্রী, অফিসাররাও খেলোয়াড়দের নিয়ে ভাবেন। খেলা নিয়ে আসে খ্যাতি টাকা ক্ষমতা— এটা ক্ষমতাসীনরা জানেন। ক্রিকেটের সঙ্গে দুর্নীতিও জড়ানো। তা বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাজনীতিকরা জানেন ক্রিকেটকে নিয়ে রাজনীতি ভালো চলে।

ক্রিকেটের জন্যে দেশের অন্যান্য খেলা বঞ্চিত হচ্ছে নানাভাবে। খেলার মাধ্যমে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন শচীন তেন্ডুলকর। দেশের সবাই তাঁর নাম জানেন। জোরালো প্রচার হচ্ছে তাঁকে ‘ভারতরত্ন’ দেওয়ার জন্যে। সম্প্রতি খেলা ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটেছে, ভারতীয় টেস্টদল ইংল্যান্ডে যে খেলা দেখিয়েছে তাতে তাদের আসমান- ছোঁয়া গৌরব মাটিতে মিশে গেছে। এই সময়ে ক্রিকেট সম্পর্কে ভাবা দরকার।

অন্যদিকে জাতি এবং সরকার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে অনেক ক্ষেত্রেই। বিশেষ করে সৈনিকদের বেলায়। অতি সজ্জন মানুষ স্যাম মানেকশ ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীর যে বিজয় এনেছিলেন তা আমাদের দেশে অনেক বছরের মধ্যে ঘটেনি। যুদ্ধজয়ের জন্যে তাঁকে সম্মান জানিয়ে সৈন্যবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ ফিল্ড মার্শাল করা হয়। আমাদের দেশে এর আগে কোনও সেনাপ্রধান ওই পদ ও সম্মান পাননি। কিন্তু তাঁকে বিদায় জানানোর সময় কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন ফৌজ করেনি। সে সময়ের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের সঙ্গে যেহেতু তাঁর মতবিরোধ ছিল, সেজন্যে মন্ত্রীমশাইয়ের নির্দেশ ছিল সেনাপ্রধান বিদায় নেওয়ার সময় কেউ সঙ্গে যাবে না। বিশেষ ট্রেনে স্যাম আর পত্নী সিলু নীলগিরি পাহাড়ের কুন্নরে চলে যান। যে বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জীবনের অনেকগুলি দশক সেখান থেকে বিদায় নিলেন একেবারে অনাড়ম্বরভাবে। তাঁর পেনসনের ক্ষেত্রেও রীতিমতো বঞ্চনা ছিল। ১২০০ টাকায় পেনসন ফিক্সড করা হয়। সঙ্গে করুণার মতো ভাতা যোগ হয়েছিল ৪০০ টাকা। যখন তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে ওয়েলিংটন ফৌজি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তখন প্রতিরক্ষা সচিব শেখর দত্ত তাঁর কাছে গিয়ে আরোগ্য কামনা করে দিয়ে আসেন পেনসন বাবদ পাওনা ১ কোটি টাকার একটা চেক। অসুস্থ স্যাম একবার চেকের দিকে তাকালেন, তারপর শ্রীদত্তকে বললেন, ‘আশা করি চেক বাউন্স করবে না।’

হৃদয়হীন ব্যাপার ঘটেছে ফিল্ড মার্শালের দেহাবসানের পরও। তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে সরকারি প্রতিনিধি একেবারেই যথাযথ ছিল না। অর্থাৎ যেমন থাকা উচিত তা থাকেনি। এমন পদের মানুষের শেষ বিদায় কীভাবে জানানো দরকার সে সম্পর্কে কোনও বিধিনিয়ম ছিল না— এটা কৈফিয়ৎ ছিল। কারণ ফিল্ড মার্শাল এর আগে কেউ তো হননি। এমন ব্যাখ্যা থাকলেও উপেক্ষা এবং অবহেলার ব্যাপারটা যে ঘটেছে তা অস্বীকার করা যাবে না। এমনকী প্রতিরক্ষা মন্ত্রক শোকবার্তায় স্যাম মানেকশর অবদানের কথা উল্লেখ করেনি। বিশেষ করে তার যুদ্ধজয়ের কথা, বাংলাদেশ নামে একটি দেশ সৃষ্টির কথা।

ইন্দিরা গান্ধী স্যামকে অন্তত দুবার ফৌজি প্রধান করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমলারা ও ফৌজের কিছু উঁচু পদের কর্তারা সব ব্যাপারটা দুবারই বানচাল করে দেন। তখন ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে যোজনা কমিশনের সদস্য করতে চান প্রতিরক্ষা দিকটা দেখার জন্যে। কিন্তু সেই কাজও দেওয়া যায়নি। ১৯৭৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই স্যামকে দেশের স্পোর্টস অথরিটির প্রধান করতে চেয়েছিলেন। তাও রূপ নেয়নি। স্যামকে আমন্ত্রণ জানালেন এক ডজনের উপর সংস্থা। পরিচালন সমিতির সদস্য হওয়ার জন্যে। সেসব সংস্থার কয়েকটি আবার দেশের বাইরের। কোনও কোনও সংস্থা সর্বোচ্চ পদ দিতে চেয়েছিল। তিনি ওবেরয় গ্রুপের সদস্য হয়েছিলেন। সমস্ত ওবেরয় হোটেলে নিজের পছন্দমতো ঘর পাবার ঢালাও অধিকার ছিল। কলকাতায় তিনি পেতেন পুরনো একটি গাড়ি। তাতে ফিল্ড মার্শালের ফ্ল্যাগ লাগানো থাকত। চালক ছিল য়ুম বাহাদুর। গোর্খাদের সঙ্গে স্যামের সম্পর্ক ছিল বরাবর। সেখানেই তিনি পরিচিতি পান স্যাম বাহাদুর নামে। সারাজীবন গোর্খাদের প্রতি টান রয়ে গিয়েছিল।

নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা সম্পর্কে স্যামের বক্তৃতা ছিল তুলনাহীন। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল, ‘লোকজন আমাকে জিগ্যেস করে কেন এমন হচ্ছে।’ জবাব একটাই : নেতৃত্বের অভাব। শুধু রাজনৈতিক নয়, প্রশাসনিক সংকট। সর্বত্র ঘটছে ব্যবসা, শিল্প থেকে সব জায়গায়। এ ব্যাপারে তিনি নেতৃত্বের নব ধারা অনুসরণের কথা বলেন। তার সঙ্গে যোগ করতেন— নেতাকে অবশ্যই মানুষ হতে হবে। অনেক সময় কথাটা বদলে বলতেন ‘বালক’ হতে হবে।

আরেক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন : আমি ফৌজে যোগ দেওয়ার ৬০ বছরের মধ্যে অনেক বদল ঘটেছে। যেমন ইংরেজি ভাষার বদল হয়েছে। আমার সময়ে কেউ কেউ মজা করে বলত ক্যাপ্টেন মানেকশ অমুক। সবটাই ছিল নির্ভেজাল পরিহাস। ফৌজি মানুষরা পড়াশোনা করতেন। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে রসবোধ ও পরিহাস প্রিয়তা অন্যমাত্রা পেত। বলা হয়েছে, ফৌজি পদস্থ ব্যক্তিদের অবসর নেওয়ার পর বিভিন্ন পদে দায়িত্ব দিয়ে বসানো হয়। জাতীয় নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ পদে পুলিশ, বিদেশ দপ্তর ও প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়া ব্যক্তিদের বসানো হয় কেন? আমেরিকায় ৮০ শতাংশ পদ নিয়োগ হয় ফৌজের কর্মরত বা অবসর নেওয়া অফিসারদের। এলোমেলো লোকজনকে জাতীয় নিরাপত্তার কাজে বসালে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তা আমরা ১৯৭২ সাল থেকে দেখছি। কিন্তু কোনও বদল নেই নীতির।

দেরাদুনে মিলিটারি অ্যাকাডেমির এক কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করে তিনি বলেছিলেন নবীন সেনাদের, ‘যুদ্ধে কোনও ‘রানার্স আপ’ হয় না এবং জাতির জীবনে পরাজিতের কোনও স্থান নেই। যদি তোমরা হেরে যাও, যদি তোমরা পশ্চাদপসরণ করো, তাহলে দেশের পক্ষে লজ্জার। তোমাদের গৃহকর্ত্রীও (ঘরওয়ালি) তোমাকে অবজ্ঞা করবে।’ একথা বলেছিলেন মৃত্যুর কিছু আগে। ৯৫ বছর বয়সে।

খেলায় পরাজয় হতে পারে, তা লোকে ভুলে যায়। কিন্তু যুদ্ধে হারের ঘা সহজে শুকোয় না। ১৯৬২ সালের যুদ্ধের স্মৃতি সারা দেশ সমগ্রভাবে স্বীকার করেছে জাতীয় অপমান হিসেবে। চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে মনস্তাত্ত্বিক ভীতি এখনও প্রবল হয়ে রয়ে গেছে।

চীনা আক্রমণের পর তেজপুরে লেফট্যানেন্ট জেনারেল মানেকশ দুর্ভাগ্যের শিকার হওয়া সেনাদের বলেন, ‘আমি এসেছি। ফিরে আসার কোনও ব্যাপার নেই।’ তিনি ১৯৭১ সালে ফৌজকে উৎসাহিত করেন জয়ের জন্যে। এখন সময় এসেছে তাঁকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মান দেওয়ার জন্যে। কারণ তিনি দেশের জন্যে অতুলনীয় সেবা করে গেছেন। শচীন তেন্ডুলকর নিজে তাঁর নামটি ভারতরত্ন দেওয়ার জন্যে বলুক—এটা আমার প্রস্তাব।

আন্নার গ্রেপ্তার ইস্যুতে কংগ্রেসকে একশ'টি পেঁয়াজ ও একশ' ঘা বেত— দুটোই খেতে হলো

সাধন কুমার পাল

রাত্রিবেলা তামাক সাজিয়ে দিয়ে শম্ভু অভিযোগ করল— বাবু, আজ সন্ধেবেলা যখন একটু অন্ধকার অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন না ওই বকুল গাছটার তলায় আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও পুরোনো ভৃত্য বুধুচরণ-কে বড় বৌঠানের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখলাম। অভিযোগ শুনে ধুয়ো ছাড়তে ছাড়তে বাবু বললেন, তা হলে কাল সকালবেলা উঠে সবার আগে ওই বকুল গাছটাই কেটে ফেলবি। তা হলেই ঝামেলা মিটে যাবে। এই গল্পের বাবুর মানসিকতার সঙ্গে বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতাশীল ইউ পি এ-টু সরকারের ম্যানেজার কংগ্রেস নেতাদের মানসিকতার বোধহয় যথেষ্ট মিল আছে। দুর্নীতির কালো টাকা, জনলোকপাল বিল ইস্যুতে দেশ উত্তাল হয়ে উঠছে দেখেও এ ব্যাপারে গতানুগতিক প্রতিক্রিয়া দেওয়া ছাড়া চোখে পড়ার মতো কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব যে ভাবে ছলে-বলে-কৌশলে আন্না হাজারে বা বাবা রামদেব-কে উচিত শিক্ষা দেওয়ার পথ বেছে নিয়েছেন তাতে মানুষের কাছে এই বার্তাটিই যাচ্ছে যে সরকার মূল ইস্যুটিকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, কিছু একটা আড়াল করতে চাইছে।

সরকারের এই ধরনের আচরণের ফল স্বরূপ এখন দেশে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে, সংসদে কি আলোচনা হচ্ছে, সরকার কি বলছে, এমন শোনার ধৈর্য যেন আমজনতার নেই। রাজনৈতিক ব্যবস্থাটির উপর যেন দেশ জোড়া একটি অবিশ্বাস অনাস্থার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। সমাজের সবচেয়ে ঘৃণিত অন্ধকার জগতের মানুষের সঙ্গে তুলনা হচ্ছে দেশের রাজনীতিকদের। সন্দেহ নেই দেশের সমস্ত রাজনীতিকদের এক পর্যায়ে ফেলে এই ধরনের সরলীকরণের প্রয়াস একটি বিপজ্জনক প্রবণতা। কারণ কোনও দেশের উন্নয়ন ও বিকাশ এমনকী অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি যেমন নীতিনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন তেমনি এর প্রতি মানুষের পূর্ণ আস্থা থাকাও দরকার। এ জন্যই এদেশে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলা হোত। দেশের চিন্তাবিদ মনীষীরাও কথায় কথায় রাম রাজ্যের কথা বলতেন।

দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটির এই ধরনের জনবিচ্ছিন্নতা যে স্বাধীনোত্তর ভারতে দেশের জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ক্রিয়াশীল ঔপনিবেশিক মানসিক ফসল এ বিষয়ে বোধ হয় খুব একটা বিতর্কের অবকাশ নেই। এই মানসিকতার কারণে এরা ভোটের বাজারে করজোড়ে জনতার সেবক হয়ে ঘুরে বেড়ায় যেন-তেন-প্রকারেণ নির্বাচিত হওয়ার জন্য। একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে এদের সিংহভাগই তখন আর জনসেবক থাকবে না। সেই জনাদেশের জোরে যেন এদের জনগণের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠার, জনগণের অর্থে নিজের মূর্তি গড়ার, কালো টাকার পাহাড় গড়ে তোলার, নিজের পরিবারের লোকের নামে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোর নামকরণ করবার, পদের লোভে অর্থের লোভে দল বদল করবার, এম পি এবং এম এল এ কিনে সরকার বাঁচাবার, নির্লজ্জের মতো অন্ধকার জগতের মানুষের সঙ্গে মাখামাখি করার অধিকার জন্মে যায়। এই ঔপনিবেশিক মানসিকতা স্বাধীনোত্তর ভারতে দেশের প্রথম শাসক হিসেবে কংগ্রেস দল পূর্ববর্তী শাসক ইংরেজদের থেকে পেয়েছে। আর চুঁইয়ে পড়া নীতিতে দেশের সবচেয়ে বড় ও অভিজ্ঞ শাসকদল কংগ্রেসের থেকেই তো এই মানসিকতা দেশের অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়িয়েছে— এ বিষয়ে বোধ হয় খুব একটা সন্দেহের অবকাশ নেই।

আন্না হাজারে জনলোকপাল বিল রূপায়িত করার দাবিতে অহিংসা আন্দোলন করতে গিয়ে শাসকদল কংগ্রেসের প্রতারণা ও দমন পীড়নের সম্মুখীন হয়ে আজ এই প্রশ্নটিও বড় করে তুলেছেন যে একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে জনপ্রতিনিধিদের কি আর জনগণের বক্তব্য শোনার দায় থাকে না? আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে সংসদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা, সাংবিধানিক নিয়মনীতির দোহাই দিয়ে আমজনতার ভাবনাকে পদদলিত করে জনপ্রতিনিধিরা কি যা খুশি তাই করতে পারে? সন্দেহ নেই যে আন্না হাজারের তোলা এই সমস্ত প্রশ্ন দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের মনে জাগ্রত থাকা ক্ষোভের আগুনকে উসকে দিয়েছে। সে জন্যই এই সমাজসেবীর অনশনকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির ইস্যুতে বীতশ্রদ্ধ গোটা দেশ এতটা উত্তাল হয়ে উঠেছে। আন্না হাজারের ডাকে দেশের

জনপ্রতিনিধিদের বাসভবনের সামনে গিয়ে মানুষ জনলোকপাল বিলের সপক্ষে কথা বলার জন্য ধরণা দিচ্ছে। এরকম একটি প্রেক্ষাপট সরকারী অর্থে রসেবসে থাকা 'বিশেষজ্ঞ'রা দেখতে পাচ্ছেন। এদের মতে এই অনশন আন্দোলনের মধ্যে নাকি এক ধরনের সন্ত্রাসবাদী ভাবনা, ব্ল্যাকমেলিং-এর ভাবনা, চাপ দিয়ে দাবি আদায়ের মতো অনৈতিক,

কংগ্রেস দলের অবস্থাটা এখন যেন অনেকটা পঞ্চায়েতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিটির মতো। যাকে কিনা বলা হয়েছিল হয় এক'শটি পেঁয়াজ খেতে হবে, না হয় এক'শ ঘা বেত খেতে হবে। লোকটি প্রথমে ভাবল বেত খাওয়ার চেয়ে পেঁয়াজ খাওয়াই ভালো। কিন্তু দুটো পেঁয়াজ খেয়ে যখন দেখল চোখ মুখ জ্বালা করছে তখন বলল তাহলে বেতই দাও। দু'ঘা বেত খাওয়ার পর যখন দেখল ব্যথা লাগছে তখন বলল তাহলে পেঁয়াজই দাও। এরকম করে শেষ পর্যন্ত একশ'ঘা বেত ও একশোটি পেঁয়াজ দুটোই খেতে হলো।

অসাংবিধানিক ক্রিয়াকলাপ লুকিয়ে আছে। এ নিয়ে গুরুগম্ভীর আলাপ-আলোচনা লেখালেখিও চলছে। অথচ, এই 'বিশেষজ্ঞ' বা বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু কখনও গণতন্ত্রের পীঠস্থান সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সংসদের ভিতর জনপ্রতিনিধিদের গুণ্ডামি, মস্তানি, বিল পাশ— প্রশ্ন করা, সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন বা সাংসদ কিনে সরকার টিকিয়ে রাখতে অবৈধ অর্থের লেনদেন নিয়ে কিন্তু দায়সারা কেতাবি আলোচনা ছাড়া সেভাবে সোচ্চার হচ্ছেন এমনটি দেখা যায়নি। সততা মূল্যবোধ জনসেবায় জীবন উৎসর্গ করলেও টাকার কুমির না হলে বিধান সভায় বা লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে প্রবেশ করা যায় না, আবার টাকার জোরে চোর-ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাস যে কেউ জনপ্রতিনিধি বনে যেতে পারে এটাই আজকের দিনে এদেশের ব্যবহারিক গণতন্ত্র। আন্না হাজারের আন্দোলনের জেরে সংসদীয় গণতন্ত্রের গরিমা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে যারা দাবি করছেন তারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন সংসদীয় গণতন্ত্র আজ এভাবে কেন নগদ অর্থের বিনিময়ে বিকোচ্ছে? কেনই বা ভারতের মতো ক্ষুধা দারিদ্র্য বেকারীতে জজ্জরিত একটি দেশের জনপ্রতিনিধিদের সিংহভাগই কোটিপতি? কেনই বা আজ লালু যাদব, অমর সিং-এর মতো দুর্নীতিগ্রস্তরা জনলোকপাল বিলের মতো দুর্নীতি নিবারক আইনের ভাগ্য নির্ধারক স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সর্ষের মধ্যে ভূত হয়ে বসে আছেন? বলার অপেক্ষা রাখে না এই সমস্ত প্রশ্নের কোনও যুক্তি সঙ্গত উত্তর নেই। আবার বর্তমান ব্যবস্থায় এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়ও সরকারের নেই। কারণ তারা যে জনগণের ভোটেই নির্বাচিত!

দুর্নীতির ইস্যুতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস অনেকদিন ধরেই কোণঠাসা হচ্ছিল। 'নির্বাক' প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে শেয়ালের কুমির ছানা প্রদর্শনের মতো বারবার দেখিয়েও পার পাচ্ছিল না। সংসদের ভেতরে বাইরে বিরোধী দল বিজেপি-র আন্দোলন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও নানা মন্তব্য, আন্না হাজারের প্রথমবার ৯৬ ঘণ্টার অনশন আন্দোলনের জেরে নতজানু কোণঠাসা কংগ্রেস বাবা রামদেব অনশনে বসতেই ফুসে উঠেছিল। মাঝরাতে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে বাবা রামদেবের অনশন আন্দোলন তছনছ করে চারদিক ধিকৃত হলেও আন্দোলনকারীদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার আনন্দে কংগ্রেসীরা সাময়িক স্বস্তি ও তৃপ্তি অনুভব করছিল। বাবা রামদেব-কে দমিয়ে দিতে কুৎসা আর পুলিশি ডান্ডার জোর দেখে উৎসাহিত কংগ্রেসীরা ১৬ আগস্ট থেকে আন্না হাজারের পূর্ব-ঘোষিত অনশন আন্দোলন একই পথে মোকাবিলা করবে এরকম আশঙ্কা বিভিন্ন মহল থেকে করা হচ্ছিল। সেই আশঙ্কা সত্য প্রমাণ হলো যখন দেখা গেল জে পি পার্কে অনশন করতে গেলে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হবে এই আশঙ্কাতেই আন্না হাজারেকে ১৬ আগস্ট সকালবেলা তার বাসভবন থেকে বন্দি করে একেবারে তিহার জেলে পুরে দেওয়া হলো। অর্থাৎ মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা হলো আন্না হাজারেও আসলে একজন সংসদীয় গরিমার উপর হামলাকারী। সেজন্যই তাকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আরেক সাংসদ হামলাকারী আফজলগুরুর পাশেই রাখা হয়েছে। আরও কুযুক্তির আশ্রয় নেওয়া হলো। বলা হলো, আন্না হাজারের পেছনে শুধু আর এস এস, বিজেপি নয়, আমেরিকাও আছে। সেজন্যই আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকা পুলিশ এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে।

কিন্তু আন্না গ্রেপ্তার হতেই দেশ জোড়া জনরোষের আগুনে পুলিশি উর্দির আড়াল ঝলসে যেতেই কংগ্রেসের কুৎসিৎ স্বৈরাচারী চেহারাটা বেড়িয়ে এল। ১৬ আগস্ট সকালবেলা গ্রেপ্তার করে সন্ধ্যা হতে না হতেই পূর্ব ঘোষিত অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে আন্না-কে মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো। এতে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের প্রাথমিক জয়ই শুধু হলো না, সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসীরা যে আইন-কানুন রক্ষা কর্তার মুখোশ পরে কত বড় বেআইনি কাজ করতে পার সেটাও উন্মোচিত হলো। কারণ, দিল্লির পুলিশ কমিশনার বিবেক গুপ্তকে দিয়ে গ্রেপ্তার করিয়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশক্রমে যাকে সাতদিনের জেল হেফাজতে রাখা হলো, তাকে আদালতে না তুলে সন্ধ্যেবেলাই মুক্ত করে দেওয়া হলো কিভাবে? মিডিয়ার রিপোর্ট থেকে যতটা জানা গেছে তাতে দেখা গেছে যে কংগ্রেস দলের স্টপ গ্যাপ সুপ্রিমো রাহুল গান্ধী দলের সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে বেচারা ম্যাজিস্ট্রেটও তার নির্দেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলো। শোনা যায় জরুরী অবস্থার সময়ও কংগ্রেসীরা সংবিধান ও বিচার ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এভাবেই বেআইনি কাজ করতেন।

তবে মুক্তি পেয়েও আন্না হাজারে তিহার জেল ছাড়লেন না। ঘোষণা করলেন নিঃশর্ত আন্দোলনের অনুমতি না দিলে তিনি তিহার জেল ছাড়বেন না। তিহার জেল হয়ে উঠল দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের অনশন মঞ্চ। আবার ঝুঁকলো ইউ পি এ সরকার। সমস্ত শর্ত মেনে নেওয়াতে আন্না ১৯ আগস্ট বেলা ১১ : ৪০ মিনিটে জনসমুদ্রে ভেসে তিহার জেল থেকে রামলীলা ময়দানে অনশনে বসেই হুঙ্কার ছাড়লেন— জনলোকপাল বিল পাশ করো, না হয় কেন্দ্রীয় সরকার গদি ছাড়ো। এই প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত যতটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে গদি বাঁচাতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার জনলোকপাল বিল নিয়ে আন্না হাজারের যাবতীয় দাবী মেনে নিতে উদ্যোগী হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ কংগ্রেসের অবস্থাটা এখন যেন অনেকটা পঞ্চায়েতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিটির মতো। যাকে কিনা বলা হয়েছিল হয় এক'শটি পেঁয়াজ খেতে হবে, না হয় এক'শ ঘা বেত খেতে হবে। লোকটি প্রথমে ভাবল বেত খাওয়ার চেয়ে পেঁয়াজ খাওয়াই ভালো। কিন্তু দুটো পেঁয়াজ খেয়ে যখন দেখল চোখ মুখ জ্বালা করছে তখন বলল তাহলে বেতই দাও। দু'ঘা বেত খাওয়ার পর দেখল ব্যথা লাগছে তখন বলল পেঁয়াজই দাও। এরকম করে শেষ পর্যন্ত একশ'ঘা বেত ও একশোটি পেঁয়াজ দুটোই খেতে হলো।

আন্না হাজারের আন্দোলন ও জন-লোকপাল বিল

রণজিৎ রায়

বিষয়টা দুর্নীতি। দেশজুড়ে দুর্নীতি আর বিপুল কালো টাকার দাপটে ৯৫ শতাংশ মানুষের পিঠ এখন দেওয়ালে ঠেকেছে। বাজারে সবজি থেকে সোনা সবই নাগালের বাইরে। অথচ সবই বিকোচ্ছে। কারণ ওই ৫ শতাংশ বিশেষ লোকেদের হাতে প্রচুর অর্থ এসেছে। কীভাবে এসেছে? দুর্নীতির চোরা পথে। কীভাবে তা' সম্ভব হয়েছে? রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষমতার শীর্ষপদকে ব্যবহার করে। এইভাবেই কী দেশ চলবে? দেশের ৫ শতাংশ মানুষ অন্য ৯৫ শতাংশকে অবাধে শোষণ করে যাবে। কেউ কী প্রতিবাদে প্রতিরোধে এগিয়ে আসবে না? ভারতের ১২০ কোটি জনতার মধ্যে কী কেউ নেই ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর? হ্যাঁ, একজন আছেন। মহারাষ্ট্রের খরাপ্রবণ জেলা আহমেদনগরের প্রত্যন্ত গ্রাম রেলিগাঁও সিডডিহিতে বাস করেন তিনি। নাম, আন্না কিসান বাবুরাও হাজারে। সংক্ষেপে, আন্না হাজারে। বয়স, ৭৪ বছর। গত ৫ এপ্রিল থেকে দফায় দফায় তিনি রাজধানী দিল্লিতে অনশন সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছেন। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সব রকম দমন পীড়ন উপেক্ষা করে। আন্নার একটিই দাবি। দুর্নীতিবাজদের কঠোর শাস্তি চাই। দ্রুত বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। শাস্তি দেবে কে? আন্না বলছেন, কেন্দ্রে জন লোকপাল এবং রাজ্যে জন লোকায়ুক্ত। এর জন্য সংসদে আইন প্রণয়ন করে ক্ষমতা দিতে হবে।

দেশে লাগামছাড়া দুর্নীতিরাজ যে চলছে তা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস জোট সরকার সে কথা মানেন। সংসদে প্রতিনিধি আছে এমন সমস্ত রাজনৈতিক দলও একমত যে ভ্রষ্টাচার ভারতের সর্বনাশ করছে। উন্নয়নের বরাদ্দ লক্ষ কোটি টাকা কিছু লোক স্রেফ চুরি করে নিজেদের পকেটে ভরছে। প্রশ্নটা তাই ঠিক এখানেই। সরকার থেকে বিরোধী দল সবাই যদি একমত তবে আন্না হাজারে, বাবা রামদেবকে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে চরম অত্যাচার করা হবে কেন? এই প্রশ্নের জবাবেই ঝুলি থেকে কালো বিড়ালটি বেরিয়ে পড়েছে। এই কালো বিড়ালটি হচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতার উচ্চ পদের মানুষজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত করার অধিকার দেওয়া যাবে না। আন্না হাজারের জনলোকপাল গঠনের প্রস্তাবকে ধামাচাপা দিতে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার লোকপাল বিল সংসদে পেশ করেছে। কিন্তু দেশজুড়ে এই সরকারি লোকপাল বিলটির প্রতিবাদে বিক্ষোভের ঝড় ওঠায় কেন্দ্র বাধ্য হয়েছে আরও বিচার বিবেচনা করার জন্য সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটি বা স্থায়ী কমিটিতে পাঠাতে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমজনতার তীব্র রোষ দেখে স্থায়ী কমিটিও ঘাবড়ে গেছে। আর তা' গেছে বলেই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লোকপাল বিলটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতামত চাওয়া হয়েছে। ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এমন নজির অতীতে আছে কিনা জানি না। কেন্দ্রের মন্ত্রিসভার অন্য সব সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত যদি লোকপাল করতে পারে তবে প্রধানমন্ত্রীকে ছোঁয়া যাবে না কেন? বৃটিশ সংবিধানে আছে, 'কিং ক্যান ডু নো রং'। রাজা কোনও অন্যায় করতে পারে না। কারণ, আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতির মতোই বৃটেনের রাজা বা রাণীকে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তই মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। ভুল সিদ্ধান্তের দায় বর্তায় মন্ত্রিসভার উপর। আবার মন্ত্রিসভার সমস্ত সিদ্ধান্তের দায় নিতে হয় প্রধানমন্ত্রীকে। প্রধানমন্ত্রীর অজান্তে বা অগোচরে দফতরের মন্ত্রীরা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। টেলিকম দুর্নীতিতে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা চুরি হয়েছে অথবা কমনওয়েলথ গেমস আয়োজক কমিটির সদস্যরা ৪০,০০০ কোটি টাকা নয়ছয় করেছে তার দায় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে নিতে হবে। আমি জানতাম না, এমন কথা প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন না। মনে রাখতে হবে যে টুজি স্পেকট্রাম বরাত দেওয়ার নীতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় হয়েছিল। তখন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সেই মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এরপরেও কী বলা যায়, আমি জানতাম না? প্রধানমন্ত্রীর পদে বসে ভবিষ্যতে কেউ দুর্নীতি করবে না এমন গ্যারান্টি দেওয়া যায় কী? একদা প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিরুদ্ধে বোফর্স কামান কেনার দালালি নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। ইন্দিরা গান্ধীও নিজের প্রধানমন্ত্রীর কুরশি বাঁচাতে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠরোধে। এরপরেও প্রণব মুখোপাধ্যায়, চিদাম্বরম বা কপিল সিব্বলরা গলা ফাটাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর পদকে লোকপালের এক্তিয়ারের বাইরে রাখতে। তবে কী তাঁরা চাইছেন কংগ্রেসের 'প্রাইম মিনিস্টার ইন ওয়েটিং' রাহুল গান্ধীকে রক্ষা কবচ দিতে। জানি না। ভবিষ্যৎ সে কথা বলবে।

অনেকেই জানতে চান কে এই আন্না হাজারে। কি তাঁর পরিচয়। মিডিয়া বলছে তিনি গান্ধীবাদী। তবে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিরোধ কেন? সম্প্রতি তিনি রামলীলা ময়দানে তাঁর অনশন মঞ্চ থেকে দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেবের আত্মবলিদানের কথা। একজন গান্ধীবাদী নেতা এমন কথা বলেন কীভাবে? একদা গান্ধীজি স্বয়ং তাঁদের মৃত্যুদণ্ডরোধে বড়লাটের কাছে আবেদন জানাতে অস্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন, হিংসার পথ যারা অনুসরণ করে তিনি তাঁদের সমর্থন করেন না। অথচ আন্না হাজারে, ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেবের দেশের মানুষের মুক্তির জন্য জীবনদানকে আদর্শ দেশপ্রেম বলে মনে করেন। বলেন, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে তারা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। আসুন আমরা সকলে ভ্রষ্টাচারের শৃঙ্খল মুক্ত করতে অনশনে প্রাণ দিতে সত্যাগ্রহ শুরু করি। তাই আন্না হাজারেকে নিছকই একজন গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহী বলে চালিয়ে দেওয়াটা মানতে পারি না।

মহারাষ্ট্রের প্রত্যন্ত গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে আন্নার জন্ম। ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণের ঘটনা তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। পরে দেশের সেবা করার লক্ষ্যে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। টানা ১৫ বছর কাজ করার পর ১৯৭৮ সালে নবম মারাঠা ব্যাটেলিয়ান থেকে অবসর নেন। তখন আন্নার বয়স ৩৯ বছর। ফিরে আসেন তাঁর পিতৃপুরুষের

ভিটে রেলিগাঁও সিডডিহি গ্রামে। এখানেই শুরু হয় তাঁর আপোষহীন লড়াই। গ্রামে স্কুল স্থাপন, বিদ্যুৎ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালান। এই আন্দোলন গড়ে তোলার সময়েই আন্না উপলব্ধি করেন সরকারি কাজকর্মে লাগাম ছাড়া দুর্নীতি। সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা খেয়ে নিচ্ছে কিছু দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক ও এক শ্রেণীর অসাধু কর্মচারী। দেশ থেকে দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলতে প্রয়োজন জনমতের। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে। আর সেই আওয়াজ তুলবে আমজনতা। কোনও রাজনৈতিক দল নয়। গড়ে তোলেন তাঁর নিজস্ব সংগঠন, 'ভ্রষ্টাচার বিরোধী জন আন্দোলন'। লক্ষ্য, দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতা ও অসাধু সরকারি কর্মীদের চিহ্নিত করে গণ আন্দোলন। অস্ত্র, অহিংস অনশন সত্যাগ্রহ। হ্যাঁ, এইটুকুই মিল গান্ধীজির পথের সঙ্গে।

দুর্নীতি দমনে লোকপাল পদ চালু করার আইডিয়াটি কিন্তু আন্না নিয়েছেন ইয়োরোপ থেকে। সেখানে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রে দুর্নীতিরোধে 'ওমবাডসম্যান' পদটি বহুকাল ধরেই আছে। সেদেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে সরকারি অফিসের কেরাণি সকলের বিরুদ্ধেই সাধারণ নাগরিকরা ওমবাডসম্যানের কাছে দুর্নীতি, হয়রানির অভিযোগ জানাতে পারেন। আন্না সেই মডেলেই তাঁর জন লোকপাল বিলের খসড়া করেছেন। এই বিলের খসড়া রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সন্তোষ হেগড়ে, সুপ্রিম কোর্টেরই প্রবীণ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, তথ্যের অধিকার আন্দোলনের নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবার বিলের খসড়া রচনাকারীদের সাহায্য করেছেন অবসরপ্রাপ্ত আই পি এস কিরণ বেদি, স্বামী অগ্নিবেশ, শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর ও মল্লিকা সারাভাই। তাঁরাই চলতি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নামকরণ করেছেন, 'ইন্ডিয়া এগেনস্ট করাপসন।' রামলীলা ময়দানে প্রতিদিন তাঁরা অনশন মঞ্চে উপস্থিত থাকেন।

আন্নার জন লোকপাল বিলে কী আছে যা মানতে কংগ্রেস নেতৃত্ব নারাজ। আন্নার জনলোকপাল বিলের খসড়ায় বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্টের মতোই জনলোকপালের অফিস হবে সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত। দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়ার পর এক বছরের মধ্যে তদন্তের কাজ শেষ করতে হবে। যদি দোষ প্রমাণিত হয় তবে দোষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কাছ থেকে ঘুষের অর্থ আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সরকারকে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। দোষীদের জেলে পাঠানোর অধিকার লোকপালের থাকবে। তবে আম-আদমির কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিলের খসড়ায় বলা হয়েছে আর্থিক দুর্নীতিই একমাত্র ভ্রষ্টাচার নয়। সরকারি অফিসে জনস্বার্থমূলক কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই শেষ করতে হবে। গড়িমসি করলে তাকে দুর্নীতি বলা হবে। যেমন, রেশন কার্ড দেওয়া, পাসপোর্ট বা ভোটার পরিচয়পত্র দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে না দিলে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মীদের শাস্তি পেতে হবে। রেশনের মাল খোলা বাজারে পাচার করা, রাস্তাঘাট মেরামতে গাফিলতি বা পঞ্চায়েতে দুর্নীতি ইত্যাদির অভিযোগের তদন্ত একমাত্র লোকপাল করবে। দোষীদের জেল জরিমানা সবই লোকপালের অফিস করবে। আদালতের হস্তক্ষেপ চলবে না। উদ্দেশ্য, দ্রুত তদন্ত ও দ্রুত শাস্তি। এখানেও বিতর্ক। আন্না চাইছেন সরকারি দফতরের কনিষ্ঠ কেরাণি থেকে বিভাগীয় সচিব সকল সরকারি কর্মীকেই লোকপালের আওতায় আনতে। ইউ পি এ সরকার বলছে, ৪০ লক্ষ সরকারি কর্মীকে লোকপালের নজরদারিতে আনতে গেলে যে বিশাল প্রশাসনিক পরিকাঠামোর প্রয়োজন তা রাতারাতি সম্ভব নয়। বড় জোর নীতিগতভাবে এই দাবি মানা যায়। বাস্তবায়িত করা অসম্ভব। আন্নার বক্তব্য, দেশের সাধারণ মানুষ কাজেকর্মে যখন সরকারি অফিসে যান তখন সেখানে তলার সারির সরকারি কর্মচারীদের হাতেই হয়রানির শিকার হন। তাই দুর্নীতির প্রশ্নে তলার সরকারি কর্মীদের সবার আগে লোকপালের নজরদারিতে আনা প্রয়োজন। মনমোহন সরকার এই দাবি মানছে না। কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র আই এ এস ও আই পি এস পদমর্যাদার অফিসারদের লোকপালের নজরদারির আওতায় আনতে চাইছে। আন্না বলছেন, রেশন কার্ড এবং পাসপোর্ট পেতে ঘুষের যে রমরমা কারবার দেশে চলছে তার পিছনে তলার সারির সরকারি কর্মীদেরই মদত থাকে। তাই জনলোকপাল বিলে তিনি চেয়েছেন আবেদনপত্র জমা দেওয়ার তিন দিনের মধ্যে রেশন কার্ড এবং ১৫ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট দিতে হবে। মনমোহন সরকার গররাজি। যুক্তি, এর ফলে কর্মী বিক্ষোভ হবে। পরামর্শ, হয়রানি হলে লিখিতভাবে বিভাগীয় প্রধানকে অভিযোগ জানান অথবা আদালতে মামলা দায়ের করুন। আন্না বলছেন, দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে লোকপালই হবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারি। শেষ কথা বলবে।

এখানেই কংগ্রেসের আপত্তি। দুর্নীতি দমনে লোকপালই শেষ কথা বলবে তা সোনিয়া গান্ধীর দল মানতে পারছে না। কংগ্রেস যুক্তি দেখাচ্ছে যে দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি এটি এক ধরণের অনাস্থা জানানো হবে। আদালতের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। লোকপালের শাস্তির বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে দেশের সংবিধানকেই বাতিল করতে হয়। আন্নার যুক্তি হচ্ছে, বিচারের দীর্ঘসূত্রতার কারণেই এবং বহুক্ষেত্রে অর্থের প্রভাব খাটিয়ে দুর্নীতিবাজরা বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। এটাই সাধারণ মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা। তাই জনলোকপাল বিলে স্পষ্টভাবে বলা আছে এক বছরের মধ্যেই তদন্ত শেষ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। গড়িমসি চলবে না। সরকারি কাজকর্মে দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রী, আমলা, কেরাণি কাউকেই ছাড়া হবে না। তবেই ধীরে ধীরে দেশ থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ একদিন সম্ভব হবে। মনে রাখতে হবে যে সাধারণ সরকারি কর্মীরা, পদস্থ আমলারা, মন্ত্রীরা, জনপ্রতিনিধিরা সকলেই জনসেবক। তাঁরা সাধারণ মানুষের কষ্টের উপার্জিত আয়ের একটি বড় অংশ নিজেদের বেতন ও ভাতা হিসাবে নেন। তাই তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অন্যান্যদের থেকে অনেক বেশি। কর্তব্যে গাফিলতি হলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। কংগ্রেস নেতারা মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধিদের সরকারি কর্মীদের থেকে আলাদা করতে চাইছে।

কপিল সিব্বল, পি চিদাম্বরমরা প্রশ্ন তুলেছেন জন লোকপাল বেঞ্চের সদস্যরাই যদি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন তখন তাঁদের বিচার করবে কে? সঙ্গত প্রশ্ন। তাই জনলোকপাল অফিসের চেহারাটা কেমন হবে দেখা যাক। বিলের খসড়ায় বলা হয়েছে লোকপাল বেঞ্চের সদস্যসংখ্যা সর্বোচ্চ সাতজন হবে। এই সদস্যদের মনোনয়ন করবে দেশের সমাজসেবী, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে। সদস্যদের মনোনয়নে রাজনৈতিক দল বা সরকারের কোনও ভূমিকা থাকবে না। সমস্যাটা এখানেই। এতবড় একটা দেশে ঐক্যমতের ভিত্তিতে লোকপাল সদস্যদের মনোনয়ন বাস্তবে সম্ভব হবে কীভাবে বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া আন্না না চাইলেও রাজনীতিকরা নানাভাবে প্রভাব খাটাবে না এমন নিশ্চয়তা কী আছে? এই পোড়া দেশে রাজনীতি বাদ দিয়ে কোনও কিছুই হয় না। এই সত্য অস্বীকার করি কীভাবে। সুতরাং লোকপাল নিয়োগে একটা ধোঁয়াশা বা অস্বচ্ছতা থেকে গেছে আন্নার খসড়া বিলে। তারপর প্রশ্ন উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত নিয়েও। আন্না হাজারে বলছেন, লোকপালের নিজস্ব পৃথক তদন্ত সংস্থা থাকবে। সেক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন, সিবিআই ইত্যাদি সংস্থার কাজ কী হবে বোঝা যায়। কারণ, এরাই এতকাল সরকারি অফিসের দুর্নীতির তদন্তের ভারপ্রাপ্ত সংস্থা ছিল। আন্না বলেছেন, এই দুই তদন্তকারী সংস্থাকে সরাসরি লোকপালের অফিসের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সরকারের খবরদারি চলবে না। বলেছেন, জন লোকপাল হবে দেশের সরকারি ক্ষেত্রে একমাত্র দুর্নীতি দমন সংস্থা। প্রয়োজনে লোকপাল নিজস্ব তদন্ত সংস্থাও গড়তে পারে। কেন্দ্রের লোকপাল বিল এবং আন্নার জন লোকপাল বিলে অধিকারের সীমা নিয়ে ছোট বড় ১০টি বিরোধ আছে। একটি উদাহরণ দিলেই বিরোধের চেহারাটা বোঝা যাবে। মনমোহন সিংয়ের সরকারি বিলে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বা সংস্থা মন্ত্রী বা আমলাদের ঘুষ দিয়েছে এবং পরে লোকপালের কাছে দুর্নীতির অভিযোগ করেছে তাকেও অপরাধী বলা হবে। ঘুষকাণ্ড ফাঁস করেছে বলে রেহাই পাবে না। আন্নার জন লোকপাল বিল বলছে ঘুষকাণ্ড ফাঁস করেছে যারা তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব লোকপালের। দুর্নীতির অভিযোগকারীকেই ফাঁসিয়ে দিলে অন্যরা অভিযোগ জানাতে ভরসা পাবে না। সেক্ষেত্রে বর্তমানে চালু প্রিভেনশন অফ্ করাপসন অ্যাক্টটির ভবিষ্যৎ কী হবে? এই আইনে বলা হয়েছে, ঘুষ দেওয়া ও ঘুষ নেওয়া সমান অপরাধ। এইখানে আরও একটি অসঙ্গতি আছে। মনমোহন এবং আন্না দুই পক্ষের লোকপাল বিলেই উল্লেখ নেই যে অভিযোগকারী

উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা অভিযোগ করে এবং তদন্তে তা প্রমাণিতও হয় সেক্ষেত্রে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে অথবা হবে না। ধরেই নেওয়া হচ্ছে সব অভিযোগই খাঁটি। একেবারে ভেজাল নেই। অথচ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে আদালতে অসংখ্য মিথ্যা অভিযোগের মামলা দায়ের হয়। এমনকী পুলিশও মিথ্যা মামলায় নিরপরাধ মানুষকে জড়িয়ে দেয়। তাই লোকপালের দরবারে মিথ্যা অভিযোগ কেউ জানাতেই পারে। তাকে শাস্তি দেওয়া হবে না কেন?

লোকপাল বিল নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে দেশজুড়ে। সরকারি ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে দুর্নীতি এখন দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। বিতর্ক যেটা আছে সেটা দুর্নীতি দমনের পদ্ধতি নিয়ে। লোকপালের ক্ষমতা ও অধিকার নিয়ে। লোকপাল নিয়োগের স্বচ্ছতা নিয়ে। সে বিতর্কটা বড় কথা নয়। ঘাত প্রতিঘাতের অভিজ্ঞার ভিত্তিতে সে সব ত্রুটি সংশোধন করা যেতে পারে। দেশের সংবিধানও অসংখ্যবার সংশোধন করা হয়েছে। সমস্যাটা অন্যত্র। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছা আছে কিনা সেটাই দেখার। কারণ, আন্নার জন লোকপাল বিল অথবা মনমোহনের লোকপাল বিল অনুমোদন করবে সংসদ। সাংসদরা কী চাইবেন লোকপালের তদন্তের মুখোমুখি হতে? অন্তত অতীতে তাঁরা বাধা দিয়েছেন। ভুললে চলবে না যে লোকপাল বিল সংসদে প্রথমবার পেশ করা হয় ১৯৬৯ সালে। নানা প্রশ্ন তুলে বিলটিকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮৫, ১৯৮৯, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ২০০১ এবং ২০০৮ সালে লোকসভায় লোকপাল বিল উত্থাপিত হয়েছে। প্রতিবারই নানা ছলছুতোয় তা ফাইল বন্দি করে রাখা হয়। দেশের কোনও রাজনৈতিক দল লোকপাল বিল অতীতে সমর্থন করেনি। হ্যাঁ, এটাই সংসদের বাস্তব চিত্র। তবে এই প্রথম একটা পরিবর্তন হয়েছে। আম জনতা রাজনীতিকদের খারিজ করে আন্না হাজারে, যোগগুরু বাবা রামদেব, শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের মতো অ-রাজনীতিকদের উপর ভরসা রেখেছে। বিশ্বাস করেছে এঁরাই দুর্নীতির লড়াইতে সাধারণ মানুষকে সঠিক পথ দেখাবেন।

আন্না হাজারের আমরণ অনশন সত্যাগ্রহের পরিণাম কী হবে তা জানা নেই। তবে তিনি সাধারণ মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস জাগিয়েছেন যে দেশ থেকে দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলা যায়। দেরি হলেও, ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ালে দুর্নীতির দানবকে পরাজিত করা সম্ভব। দিল্লির রামলীলা ময়দানে জনজোয়ার সেই বিশ্বাসের কথাই বলছে। আমরাও বিশ্বাস রাখি যে অনশনে এক আন্না আত্মাহুতি দিলে সেই যজ্ঞের আগুন থেকে লক্ষ আন্নার জন্ম হবে।

অন্য রকম

ইতিহাসের আকর উপাদানের লেখনীকার

বংশাবলী লেখক

বিশেষ প্রতিনিধি॥ 'ইতিহাস ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। সাধারণ মানুষ উদ্যোগ নিলে অনেক হারানো ইতিহাস ধরা যায়।' একথা বহুজন বলেছেন। দেশের কোথাও কোথাও ওই ধরনের কাজ হয়েছেও। অনেকটা কাজ এগিয়েছেও। রাজস্থানে প্রায় দু'লক্ষ বংশাবলী লেখক রয়েছেন। সারা ভারতে সংখ্যাটা প্রায় এক কোটি। ওই বংশাবলী থেকে ইতিহাসের খসড়া তৈরি সহজ হতে পারে। কারণ তা থেকে অনেক উপাদান মেলে ইতিহাস রচনার জন্যে। দেশজ ইতিহাসকারদের কখনও হেলাফেলা করা উচিত নয়। সম্প্রতি একথা শোনা গেল জয়পুরে বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্যাম আচার্যের মুখে। 'পাথেয় কণ' পত্রিকার দেশজ ইতিহাসকার বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষে হাজির হয়েছিলেন অনেক বিশিষ্ট মানুষ। লোক-ইতিহাস রচনাকে গুরুত্ব দেন সব বক্তাই। বংশাবলী সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের জন্যে যে সরকারি সংস্থা রয়েছে তার প্রধান রাও মহেন্দ্র সিং বোরাজ ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। তিনি সংস্থার পরিচয় জানিয়ে বলেন, আমাদের জন্মের সময় থেকে বংশ পরিচয় লেখার কাজ শুরু হয়ে যায়। আর এই বংশাবলী লেখা হয় বলেই ভারতের ইতিহাস এখনও নষ্ট হয়নি।

'পাথেয় কণ' সংস্থার প্রধান পুরুষোত্তম চতুর্বেদী বলেন, পাথেয় কণ ভারতীয় পরম্পরা তথা রাষ্ট্রহিতের সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ একেবারে তৃণমূল স্তরে থাকা মানুষদের কাছে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে কাজ করছে। পত্রিকার সম্পাদক কানাইয়ালাল চতুর্বেদী বলেন, হানাহানি ও উপদ্রবের ইতিহাস লিখেছেন পাশ্চাত্যের ইতিহাসকাররা। ভারতে ইতিহাস লেখা হয়েছে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের। বংশাবলী রচনার পরম্পরার মাধ্যমে দেশের প্রত্যেক পরিবারের প্রামাণিক ইতিহাস লেখা হয়ে যাচ্ছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সহ-সভাপতি ওঁকার সিং লখাওত বলেন, বংশাবলী লেখার কাজ নিজেদের শিকড়কে খুঁজে পাওয়ার জন্য। বংশাবলী লিখন নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার মধ্যে ইতিহাসের বড় কাজ হয়েছে। এক একটি বংশাবলী ইঁটের কাজ করে ইতিহাসের ইমারত গড়ে তুলতে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে বংশাবলী ঠিকভাবে লেখা ও যত্নে রাখা হলে আঞ্চলিক ইতিহাসের অনেক উপাদান পাওয়া যাবে।

অসম সরকারের স্বীকারোক্তি

অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই ধস নেমেছে অর্থনীতিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অনুপ্রবেশের ভারে জর্জরিত অসমের অর্থনীতি। ব্যাপকহারে বাংলাদেশ, সাবেক পূর্ববঙ্গ এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখনও অবিরত অভিভাসন হয়ে আসছে। একথা এবার স্বীকার করে নিল স্বয়ং রাজ্য সরকার, রাজ্য সরকারের 'আর্থিক ও পরিসংখ্যান নির্দেশালয়' ২০১০-এ রাজ্যের আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ওই রিপোর্টে সরকার নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, রাজ্যের ঘরোয়া মাথাপিছু গড় আয় কমেছে এবং তার মূল কারণ ব্যাপকহারে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন। এটাই বাস্তব সত্য।

রাজ্য সরকার সততার সঙ্গে ওই রিপোর্টে স্বীকার করে নিয়ে বলেছে— ''অসম ব্যাপক সংখ্যায় বৈদেশিক অভিবাসনের শিকার। বিগত শতকের প্রত্যেক দশকেই অসমের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সারা ভারতবর্ষের গড় বৃদ্ধির তুলনায় বেশি। ব্যাপকহারে অভিবাসনের ফলেই এই ব্যাপক বৈষম্য। সব থেকে বেশি সতর্কতা ও গণ্ডগোলের বিষয় হলো, প্রতিবেশী দেশ থেকে লাগাতার অনুপ্রবেশ হয়েই চলেছে, বিরাম নেই। থামার কোনও লক্ষণই নেই। ২০০১-এর জনগণনা অনুসারে জনবসতির ঘনত্ব ৩৪০ জন, ১৯৯১-এ ছিল ২৮৬ জন। ২০০১-এ ভারতবর্ষের জনবসতির ঘনত্ব ছিল ৩২৫ জন।''

রাজ্যের ঘরোয়া উৎপাদন (Gross State Domestic Product) বিষয়ে রাজ্য সরকার জানিয়েছে— ঘরোয়া উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ৭.৪ শতাংশ (২০০৪—০৫ এ প্রকৃত ঘরোয়া উৎপাদন বৃদ্ধি) আশা করা হয়েছিল। ২০১০—২০১১ অর্থবৎসরে আগাম অনুমান ছিল ৮.১ শতাংশ। প্রত্যেকবারই আগাম অনুমানের থেকে প্রকৃত ঘরোয়া উৎপাদন বৃদ্ধি অনেক কম। অনুমান ছিল ৭৫০৮২.০৭ কোটি টাকা, প্রকৃত উৎপাদন ৬৯৯২৩.৬৫ কোটি। কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য মিলিয়ে মোট ঘরোয়া বৃদ্ধি শতাংশের হারে ৭.৪ শতাংশ ধরা হয়েছিল। আগে থেকে করা অনুমানের ভিত্তিতে খনি, কোয়ারি (নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত মিলিয়ে), বিদ্যুৎ, গ্যাস, জল সরবরাহ এবং নির্মাণ ক্ষেত্রে বিগত বছরের থেকে রাজ্যের মোট উৎপাদন আগের বছরের তুলনায় (২০০৯-১০) ২.৯ শতাংশ কম হবে ধরা হয়েছিল।

রাজ্য সরকারের বক্তব্য পরিষেবা ক্ষেত্রে ব্যবসায়, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পরিবহন, রিয়েল এস্টেট, যোগাযোগ, ব্যাঙ্কিং এবং ইন্স্যুরেন্স, সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিষেবা মিলিয়ে রাজ্যের আয় বৃদ্ধির কথা। ২০০৯-১০-এ ১২.২ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছিল। আগামী ২০১১-১১ তা থেকে বেশি অনুমান করা হয়েছে। কেননা ২০০৯-১০-এ আশানুরূপ বৃদ্ধি হয়নি।

রাজ্যের বকেয়া ঋণের পরিমাণ ২০০৯-১০-এ ছিল ২৩৮৩২.৯৪ কোটি টাকা, যা মোট ঘরোয়া উৎপাদনের ২৭ শতাংশ। ২০১০-এ মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ৮১৯৪ টাকা। রাজ্য সরকারের সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে— ''অসমের অর্থনীতির লাগাতার অবক্ষয় ঘটে চলেছে। কৃষিতে যে শ্রমশক্তি ব্যবহৃত হয় তা ২০১১'র জনগণনা অনুসারে প্রদেশের মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থ বৎসরের পরিসংখ্যান অনুসারে রাজ্যের ঘরোয়া উৎপাদনের ২৫ শতাংশ'র বেশি আসে কৃষিক্ষেত্র থেকে। সমীক্ষা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে— সেচ বিভাগের অতিরিক্ত সেচের ব্যবস্থা করাতেও লাভের লাভ হয়নি। রাজ্যের শিল্পোদ্যোগও বেকারদের কাজ দিতে পারেনি, ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রও ব্যর্থ। এমনকী বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও রাজ্য তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করে উঠতে পারেনি। বিগত কয়েক বছরে ৪০১.৫ এম ইউ-এর আশেপাশেই রয়েছে।

এককথায় উন্নয়নের গতি বাড়েনি অথবা এক জায়গায় দাঁড়ানোর মূল কারণই হলো রাজ্যে ব্যাপকমাত্রায় বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন। সরাসরি না বললেও সরকার এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। কিন্তু ভোটব্যাঙ্ক পলিটিক্সের জন্য সরকার জেগে ঘুমিয়ে আছে।

দিদি, শেষে রবীন্দ্র-নজরুলকেও 'আমরা-ওরা' করে দিলেন!

মাননীয়
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,

প্রথমে প্রণাম জানবেন। না, আপনার মতো করে 'প্রণাম-সালাম' বলতে পারলাম না। মাফ করবেন। আপনি তো 'ম্যাডাম', 'মুখ্যমন্ত্রী' এসব কিছুই শুনতে পছন্দ করেন না। আপনি চান সকলে আপনাকে 'দিদি' বলেই ডাকুক। দু'টো অপছন্দের কাজ করতে পারব না। তাই আপনাকে 'দিদি' বলেই না হয় সম্বোধন করছি। কিন্তু ওই এক বন্ধনীতে 'প্রণাম-সালাম'-টা বলতে পারব না। যেখানে যেটা দরকার তাঁকে সেই ভাষাতেই শুভেচ্ছা জানাব। তাই একজন আদ্যোপান্ত বাঙালি হিসেবে সকলকে 'প্রণাম' জানালেই সম্ভবত এই বঙ্গভূমির সকল বাসিন্দাকে শুভেচ্ছা, সম্মান, অভিনন্দন জানানো যায়।

আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতায় এসেছেন ২০ মে। এই লেখা প্রকাশিত হওয়ার সময় আপনার 'মা-মাটি-মানুষ' সরকারের একশো দিন পার হয়ে গেছে। এই একশো দিনে আপনাকে শতাধিক অনুষ্ঠানে দেখেছে বাংলা। যার প্রতিটিতেই একাধিকবার করে আপনি 'প্রণাম-সালাম' বলেছেন। ভোটের আগে তো কথাই নেই। দিদি, আপনি কি মনে করেন এ রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা এতটাই বোকা? তাঁরা শুধু প্রণামে খুশি হবেন না? সালাম না শুনলে তাঁরা সম্মানিত হবেন না?

শপথ যেদিনই নিন আসলে রাজ্যের ক্ষমতায় আপনি বসে গেছেন ১৩ মে। আপনার দলের, না বলে বলা উচিত আপনার বিপুল জয়ের পরে। সেদিন নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর গোটা বাংলাকে যে পথে আপনি শান্ত রাখলেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এখনও মনে আছে সেদিন আপনি কালীঘাটের বাড়িতে বসে বলেছিলেন কোনও বিজয় মিছিল নয়, বিজয় উৎসব নয়, পাড়ায় পাড়ায় জয়ের আনন্দে শুধু গান বাজাবে। বেজেও ছিল। খুব ভালোও লেগেছিল। কিন্তু আপনার সেই ঘোষণাটা ভালো লাগেনি। আপনি সেদিন বলেছিলেন, বিজয় মিছিল নয়। সব জায়গায় গান বাজবে। রবীন্দ্রনাথও বাজবে, নজরুলও বাজবে।

শুনেই একটা ধাক্কা লেগেছিল। আমার প্রাণের ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ যে হিন্দু সেকথা এতদিন আমায় কেউ বলেনি। রবীন্দ্রনাথও না। তিনি বিশ্বকবি। তিনি ভারতের ঋষিকবি। কিন্তু তিনি আলাদা করে হিন্দুদের কবি ছিলেন না। আপনি করে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যদি প্রাণের ঠাকুর হন তবে কবি নজরুল হলেন প্রাণের কবি। যে কোনও ভালো লাগায় যেমন রবি ঠাকুরের কথা মনে পড়ে ঠিক তেমনই যে কোনও অন্যায় দেখলে মনটা বিদ্রোহী কবির শরণ নেয়। দেশভাগের পর এই কবিই তো লিখেছিলেন, 'পাকিস্তান না ফাঁকিস্তান'। পরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে বাংলাদেশে চলে যেতে হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে ধর্মগত রাজনীতিও হয়েছে। কিন্তু বাঙালি মনে তিনি কখনও মুসলিম কবির তকমা পাননি। বাঙালির কাছে অন্য কিছু নয়, শুধু কবি পরিচয়েই রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত এক বন্ধনীতে উচ্চারিত হন।

দিদি, আপনি যেদিন ওই 'রবীন্দ্রও বাজবে, নজরুলও বাজবে' বলেছিলেন, যখন বাংলার দুই শ্রেষ্ঠ কবিকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করেছিলেন, তখন সেটা এই কলমচির কানে গরম সিসার মতো ঢুকেছিল। তারপর সেই দিনটা, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ (ইংরাজি ২৬ মে, ২০১১)। দিদি মনে আছে? কবি নজরুলের জন্মদিন। আপনি মহাকরণের অলিন্দে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, নজরুলের জন্মদিনে মুসলিম ভাইদের জন্য উপহার, মুর্শিদাবাদে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হবে 'আলিয়া মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়'। সেদিন খুব মনে পড়ছিল ছোটবেলায় পড়া অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই কবিতাটা— ভুল হয়ে গেছে বিলকুল, আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে, ভাগ হয়নিকো নজরুল।

আপনি দিদি ভাগ করে দিলেন।

আজকাল বেশকিছু মাদ্রাসায়, বিশেষত সীমান্ত এলাকায় এমন কিছু দেশ-বিরোধী কাজকর্ম চলে যা দেখতে পেলে কবি নজরুল নিশ্চিত প্রতিবাদ করতেন। এক সময় আপনার পূর্বসুরী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সেই কাজ কারবারের বিরুদ্ধে একবার কথা বলেছিলেন। তারপর অবশ্য দলের চাপে, মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের চাপে তাঁকে ঢোক গিলতে হয়েছিল। জানি, বুদ্ধবাবু যে ভুল করেছিলেন আপনি সেটা করবেন না। হাজার অপকর্মের খবর পেলেও আপনি 'পলিটিক্যালি কারেক্ট' থাকবেন। প্রশাসনকে বলবেন মাদ্রাসাকে 'আনটাচেবল' রাখতে। বলবেন মুসলমানরা সংখ্যালঘু। বারাবার 'সালাম' জানিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন, তোমরা 'সিটিজেন উইথ আ ডিফারেন্স'। তোমাদের আসল পরিচয় তোমরা ভোটব্যাঙ্ক। ওঁদের সাত খুন মাপ। আপনি নিজেই এমন করবেন কারণ, বুদ্ধবাবুর তো ভুল শুধরে দেওয়ার জন্য একটা দল ছিল। আপনার সেটা নেই। আপনি নিজেই তো দল।

এবার কোন দিন শুনব আপনি স্লোগান বদলে ফেলেছেন। নতুন স্লোগান হবে 'আম্মা-মাটি-মানুষ'। নিজেকে আপনি হয়তো 'দিদি'র বদলে 'আপা' ডাকলে খুশি হবেন। কিন্তু দিদি, আপনাকে আবার বলছি, আপনি কি রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে এতটাই বোকা ভাবেন? তাঁরা এতটাই কি নির্বোধ? যে বুঝবেন না, 'মা' না ডেকে 'আম্মা' ডাকলে মাতৃত্বের স্বাদ বদলে যায় না? রবীন্দ্রনাথের জন্ম সার্ধ শতবর্ষ আপনি বেশ ঘটা করেই পালন করেছেন। পরপর দু'দিন স্কুল ছুটি না দিলেও বাঙালি আপনাক আশীর্বাদই করত। জানি, রাস্তায় মোড়ে মোড়ে আপনি ট্রাফিক সিগনালে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজানোর ব্যবস্থাটা অন্তর থেকেই করেছেন। সঙ্গে এটাও জানি যে আপনি কবি নজরুলকে নিয়েও একটা কিছু করার কথা ভাবছেন। একটা উপলক্ষ দরকার আপনার। হিন্দু কবির পর মুসলিম কবির দিকে নজর না দিলে যে মেকি সেকুলার পলিটিক্সের 'ব্যালান্স থিওরি' কার্যকর হবে না।

দোহাই দিদি, এত তোষণ ভালো নয়। আর তোষণের নামে যেটা করছেন তার ফল ভালো হবে না। বারবার তোমরা মুসলমান মনে করিয়ে দিলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বেশি করে ছড়াবে। আপনি যে দল ছেড়ে এসেছেন সেই কংগ্রেস স্বাধীনতার আগে থেকে সেই কাজটা করে আসছে। আজও তার খেসারৎ দিতে হচ্ছে দেশকে। যাদের হঠিয়ে রাজ্যে পরিবর্তনের কাণ্ডারী হলেন সেই বামপন্থীরাও একই ভুল করে গেছে। এবার বদলান। আপনি ক্ষমতায় এসে বলেছিলেন, আগের সরকারের মতো 'আমরা-ওরা' করবেন না। কিন্তু এখন দেখছি আপনি সবার থেকে এক কাঠি বাড়া। একদিকে 'প্রণাম' অন্যদিকে 'সালাম' ভাগটা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকেও কি স্বচ্ছন্দে আপনি 'আমরা-ওরা'য় বিভাজন করে দিলেন!

হে বাংলার কাণ্ডারী, মনে রাখুন
বাংলার কবির সেই আহ্বান—
কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান
মোর মার।

—নমস্কারান্তে
সুন্দর মৌলিক।

আমি রবীন্দ্রনাথ বলছি....

নটরাজ ভারতী

আমি রবীন্দ্রনাথ বলছি। তোদের রবিঠাকুর। ওসব গুরুদেব-ফুরুদেব নয়। একেবারে বাঙলার কবি। তোরা আমার সার্ধশতবর্ষ করছিস না, শ্রাদ্ধ শতবর্ষ করছিস তাইতো বুঝতে পারছি না, লম্বা লম্বা ঝুলওয়ালা পাঞ্জাবি পরে তোদের আঁতলামো দেখলে মনে হবে তোরা সব কত বড় রবীন্দ্রভক্ত! আসলে তোরা যে কি রসের ভক্ত সেতো আমি জানি।

এমন নয় যে তোদের এই আঁতলামো এই প্রথম। এর আগেও করেছিস। আমার জন্মের ১২৫ বছরে। হেঁটে চলে গেলি জোড়াসাঁকো থেকে শান্তিনিকেতন। ভাবলি এবার বোধহয় সংস্কৃতির বানে ভেসে যাবে। হলো ঠিক তার উল্টো।

গত এক বছর ধরে তোরা আমাকে নিয়ে যা শুরু করেছিস তাতে মনে হচ্ছে আমি একটা ভাল কাঁচামাল। আমাকে ভাঙিয়ে ইচ্ছেমত বাই প্রোডাক্ট বানিয়ে বিক্রী করো। এই মন্দার বাজারেও কাটতি ভাল। আমি কবে কোথায় কি বলেছি তার প্রেক্ষিত বিচার না করেই একটা দুটো লাইন বলতে পারলেই হলো। ব্যস তাহলেই তোরা সব রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ। আসলে আমি তো জানি তোদের এই বিশেষজ্ঞতা বিশেষ অজ্ঞতা।

আমি চাইলাম তোদের চিত্ত ভয়শূন্য হবে অন্ততঃ মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখবি। তোরা ঠিক উল্টো করলি, মাথা ঠুকতে শুরু করলি দলের কাছে। দাদার কাছে। লোভের বেড়াজাল তোদের রুদ্ধ করলো। মুক্ত মুক্তি এসব ব্যাপারটাই আর তোদের মধ্যে নেই। স্টেজে উঠে গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করছিস—চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির। তারপর স্টেজ থেকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করছিস দাদা রাস্তায় ভয় নেই তো। ''কয়েকদিন আগে তোদের এক বিখ্যাত গায়িকা স্টেজে উঠে গাইছে— আমি ভয় করবো না ভয় করবো না।'' তাকিয়ে দেখি তার চার আঙুলে চারটে আঙটি। গোমেদ, পলা, মুনস্টোন তার মানে ভয় তার জীবন জুড়ে। প্রতি মুহূর্তে গ্রহের ভয়। তাই এরা যখন চিৎকার করে বলে আমি ভয় করবো না তখন কেউ বিশ্বাস করে না।

আমি কি চাইলাম আর তোরা কি করছিস

তা বোঝা যায় বিশ্বভারতীর দিকে তাকালে। আমি চাইলাম উপনিষদের আদর্শে একটা আশ্রম, ব্রহ্মচর্য আশ্রম। জীবনের প্রথমেই ছাত্রছাত্রীরা শিখবে ''তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা''। ত্যাগ আর ব্রহ্মচর্য হবে আদর্শ। সেই মতো চেষ্টা করলাম। এক স্বর্গীয় আনন্দের সন্ধান পেতে চেয়েছিলাম। দিতে চেয়েছিলাম আনন্দরূপ অমৃতের সন্ধান। এখন ব্রহ্মচর্যের বালাই নেই। অমৃত মানে মদ। মদামৃতম। আর ব্রহ্মচর্যের কোনও ধারণাই কারও মধ্যে নেই। না শিক্ষক-শিক্ষিকার না ছাত্রছাত্রীর। তোদের ধারণা চারপাশে গাছ আর গাছের নিচে পড়ালেই বোধহয় আশ্রম শিক্ষা। তাই কি আর হয় রে! জীবনের গভীরতা খুঁজতে হয়। আশ্রম বালক বালিকাদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে— হ্যাঁ এরা আশ্রম বালক। আর এখন তোদের ছাত্রছাত্রীদের মুখের ভাষা শুনলে আর পোশাক-আশাক দেখলেই বোঝা যায় কি সাঙ্ঘাতিক আশ্রম তৈরি করেছিস। দশমশ্রেণীর ছাত্রীও গর্ভবতী হয়। যত্রতত্র পাওয়া যায় কন্ডোম। এমনকী উপাসনা মন্দিরের ভিতরেও। ব্রহ্মচর্য কোথায় পৌঁছেছে বুঝতে পারছিস? আমি চেয়েছিলাম চারদিকে গাছ লাগিয়ে বেদান্তের ভাবনায় একটা তপোবন। তোরা সবাই মিলে সেটাকে জঙ্গল করে দিলি। তপোবন আর জঙ্গলের পার্থক্যটাই বুঝলি না।

তোদের এক উপাচার্যের দুর্নীতি নিয়ে কিছুদিন গোটা বিশ্বভারতী অচল করে দিলি। তারপর চুপ করে গেলি। ফল পর্বতের ছুঁচো প্রসব। ভারতীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে এমনই হয়। তোদের বহু শিক্ষকই স্রেফ ভুসো মাল। জাল সার্টিফিকেট দিয়ে ধরা পড়ে জেলও খেটেছে কেউ কেউ। অথচ ভাবটা এমন যেন তোরা সব বনস্পতি।

শিক্ষা সম্পর্কে আমি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ধারণা ও সংজ্ঞা দিয়েছিলাম। আমি লিখেছিলাম তাকেই বলি শিক্ষা যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে। আমি বললাম ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয় জ্ঞানের শিক্ষা নয় বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান ঠাঁই দিতে হবে। তোরা সেটাকেই বাদ দিয়ে দিলি। এর ফল যা হবার তাই হয়েছে। বিশ্বভারতী এক নির্বোধের আখড়াতে পরিণত হয়েছে।

তোদের ধারণা মাইক লাগিয়ে চোঙা ফুঁকলেই হলো। চারিদিকে যা কিছু হচ্ছে সবই যেন আমার জন্মের দেড়শো বছরের জন্য। ভাবনা এমন করছিস যেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তোরা কিছুই বুঝিস না। শাসকদল-বিরোধী দলের মধ্যেও দড়ি টানাটানি চলছে। অথচ দেশের স্বার্থে কিছুতেই এক হতে পারলি না। কোথায় উপনিষদের আদর্শ— আধ্যাত্মিকতা— আর কোথায় তোদের নিপাট ধান্দাবাজি।

আমি বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য হিন্দুদের এক হবার কথা বলেছি। এক নয় বলে যে বার বার মার খেয়েছিস সে কথাও বলেছি। তবু তোরা কিছুতেই এক হবি না। আজও মার খাচ্ছিস তবুও না। আমি বললাম— হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে। তার মানে যে যত বড়ই হোক একদিন ভারতের কাছে মাথা নিচু করতে হবেই। কিন্তু সেটা তখনই হবে যখন তোদের মধ্যে চেতনা জাগ্রত হবে। তোরা নিজের দিকে তাকাবি। দেশের দিকে তাকাবি। কিন্তু তা নয়। সার্ধজন্মশতবর্ষ নিয়ে যতই চিৎকার কর— কাজের কাজ কিছুই হবে না।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস

প্রতি বৎসর আমরা বিশ্বে ১১ জুলাই বিশ্বজনসংখ্যা দিবস পালন করছি। কিন্তু ১১ জুলাই '১১ ওই জনসংখ্যা দিবসেই একটি সংবাদ জেনে সাধারণের কথা বাদ দিলেও কেন্দ্রীয় সরকারেরও এই বিষয়ে কোনও আন্তরিকতা আছে কিনা মনে হলো না।

২০০১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১০২ কোটি। সাম্প্রতিক জনসংখ্যার ভিত্তিতে বর্তমানে এই সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ১২১ কোটি। অর্থাৎ দশ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে ১৯ কোটি। সরকারী বিজ্ঞাপন দেখে মনে হলো সরকার এ বিষয়ে চিন্তিত। কিন্তু কি করলে এই জনসংখ্যার ঊর্ধ্বগতি রোধ করা যায় যে বিষয়ে সরকার কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না।

প্রস্তাব রাখছি, আইন করা হোক হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি জাতি নির্বিশেষে কোনও স্বামীর/পুরুষের দুইটির অধিক সন্তান থাকবে না। কেবলমাত্র দুইটি সন্তান কন্যা হলে মাত্র একটি অধিক তাঁরা চাইতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাঁদের সরকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের কাছে অনুমতি চাইতে হবে। এই আইন বলবৎ হওয়ার পর কারও দুইটির অধিক সন্তান হলে (উপরোক্ত সরকারী অনুমতি ছাড়া) তিনি সমস্ত রকমের সরকারী সাহায্য, ঋণ, চাকুরি থেকে বঞ্চিত হবেন। পৃথিবীতে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আশা করা যায় আন্তর্জাতিক স্তরেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বিষয়ে চিন্তা করছে ও করবে।

—হৃষীকেশ কর, বিবি-১৭৯, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৬৪।

নট এ ভাই,- নট এ পাই

গত ২৩ মে, স্বস্তিকার ৬৩ বর্ষ, ৩৬তম সংখ্যায় বিমলেন্দু ঘোষ মহাশয়ের পত্র দেখলাম। ''নট এ ভাই—নট এ পাই'' এই আন্দোলনটা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি করেনি; একথা একবারও বলিনি বা ওই আন্দোলনটা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি করেছে একথাও বলিনি। গান্ধীজী কি করেছিলেন সেকথাই মাত্র বলেছি। গান্ধীজীর মূল আন্দোলন ছিল ''অহিংসা-অসহযোগ''। আর এই মূল অহিংসা-অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবেই তাঁর ডান্ডি অভিযান— বা লবণ সত্যাগ্রহ, অর্থাৎ লবণ প্রস্তুত করব কিন্তু লবণের উপর যে কর বসানো আছে সেটা দেব না। বিদেশী দ্রব্য (বস্ত্রসহ) বর্জ্জন। কারণ ওই বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার

মানেই তার উপর কর বসানো আছে অর্থাৎ ওই ভাবে টাকা দেওয়া হচ্ছে। ওটা বন্ধ করতে হবে। তাই বিদেশী দ্রব্য বর্জন— ওটাই ''নট এ পাই''। এমনকী ১৯৪১ সালে সেনসাস—লোক গণনার সময়ও গান্ধীজী বলেছিলেন ''সেনসাস'' বয়কট করতে। কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন সেনসাস্ রিপোর্ট সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালাবার জন্য প্রয়োজন। অতএব সেনসাস বয়কট কর। এবং তারজন্যও অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। অখণ্ড বাংলায় ১৯৩১ সালেও হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ; কিন্তু ১৯৪১ সালে গান্ধীজীর আন্দোলনের ফলে হিন্দুরা লোক গণনার সময় গুরুত্ব দিয়ে পরিবারের মধ্যে সকলের সংখ্যা রেকর্ড করাল না; ফলে সকল হিন্দুর সংখ্যা রেকর্ডে প্রতিফলিত হলো না। অপরদিকে মুসলমানরা সকলের নাম নথিভুক্ত করাল তো বটেই উল্টে তারা বেশী-বেশী সংখ্যায় লোক গণনায় যোগ করে দিয়েছিল। আর সেই ১৯৪১ সালের লোক গণনার হিসাবের ভিত্তিতেই ভারত ভাগ হয়ে গেল কারণ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেখান হয়েছিল লোক গণনার ফলাফলে।

সে যাই বা হোক, একটা দল একটা ইস্যু দিয়ে আন্দোলন করছে বলে অন্যদল সেই ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করবে না এমন তো হতে পারে না। তাই গান্ধীজী যেটা করেছিলেন সেটা কমিউনিস্টরা করবে না এমন হতে পারে না বা করবেই যে এমনও নয়। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্টদের যে সবার আড়ালে নিবিড় যোগাযোগ; তা হয়তো বিমলেন্দু ঘোষ মহাশয় খেয়ালে রাখেননি। যেমন একটা টাটকা উদাহরণ দিই। 'দৃষ্টান্ত' নামে একটা পাক্ষিক পত্রিকার '১—১৫ আগস্ট ২০১১ সংখ্যায়' ১৮ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে— '১৯৭১ সাল থেকে কে জি বি সোনিয়া এবং তার মাকে অর্থ সাহায্য করেছে।' ''দৃষ্টান্ত'' পত্রিকার ওই সংখ্যাটা এখনও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। পারলে সংগ্রহ করে পড়ে নিতে পারেন। বুঝতে পারবেন কারা আমাদের দেশ চালাচ্ছে এবং আমাদের দেশের পরিণতিই বা কী হতে পারে!

—গোপীনাথ দে, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী।

মুখ্যমন্ত্রীকে কৃষকদের প্রতি সুবিচারের আবেদন

বিগত ৩৪ বছরের অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা অবহেলিত, অপমানিত এবং মৃতপ্রায়। বাম জামানার 'কৃষি আমাদের ভিত্তি'-র স্লোগানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষককে মাটির নিচে ভিত্তিতে পরিণত করা হয়েছে। এই অবস্থা থেকে কৃষককে একটু ভাল অবস্থায় রাখার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে নিম্নলিখিত দাবীর আবেদন জানাচ্ছি।

১। স্বাস্থ্য-শিক্ষার মতো কৃষিকে অত্যাবশ্যক পণ্য হিসেবে গ্রহণ করা। কারণ, স্বাস্থ্যেরও আগে মানুষের আহারের প্রয়োজন, তাই কৃষক ও কৃষির প্রতি বিশেষ সুনজরের আর্জি।

২। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকরা প্রত্যক্ষভাবে শ্রমদিবস সৃষ্টি করে, সমাজের এক অংশের মানুষের কাজের ব্যবস্থা করে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সরকারকে সাহায্য করে। কিন্তু সরকারীভাবে কৃষককে কোনও সাহায্য করা হয়নি।

৩। কৃষকরা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দশকোটি মানুষের আহার জোগায়, বিনিময়ে তাদের সংসার চালাবার জন্য তাদেরকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়।

৪। স্বাধীনতার ৬৫ বছরেও গ্রামে গ্রামে সরকারী ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র নেই। তাই মহাজনের কাছে কৃষককে নিঃশেষ হতে হয়।

৫। কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের মাশুলের অনুদানের প্রয়োজন। সার এবং বাজার-দরের সমতা রেখে ফসলের দাম-এর নির্ধারণ করা দরকার।

এজন্য আপনার কাছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের পক্ষ থেকে সবিনয় নিবেদন, আপনি ব্যক্তিগত ভাবে এবং সরকারী উদ্যোগে বিষয়গুলির সমস্যা-সমাধানে আগ্রহী হন। কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি হলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি হবেই এই আশা রেখে আবেদন শেষ করছি।

—উদয় চাঁদ নায়ক, আনগুনা, বর্ধমান।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতো একজন বরণীয় ব্যক্তিত্বকে নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো একটা মহান্ কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের সার্ধজন্মশতবর্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

হয়েছে। এই অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রয়াণদিবস ২২ শ্রাবণ সকলের কাছেই বেদনাদায়ক। যে কোনও ধরনের ব্যক্তির প্রয়াণই মানুষের কাছে দুঃখ তথা শোকের বার্তা বয়ে আনে। কিন্তু নবগঠিত রাজ্যসরকারের কাছে বিশ্বকবির প্রয়াণদিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে আলোকসজ্জাসহ বিভিন্ন কর্মসচীর আয়োজন করার নির্দেশ কি সামঞ্জস্যপূর্ণ? সর্বোপরি প্রয়াণদিবস ছাড়াও পরের দিনও সরকারী বা আধাসরকারী স্কুলগুলোতে ছুটির নির্দেশ দেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? যে কোনও মহান্ ব্যক্তির জন্মদিনটিকে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। কিন্তু কারও তিরোধান দিবসে আমোদমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা বেমানান দেখায়। হতে পারে রবীন্দ্রনাথের সার্ধজন্মশতবর্ষের সঙ্গে প্রয়াণ দিবসকে একটা অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেছে রাজ্য সরকার। এরপর হয়তো কবি নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুদিনও সাড়ম্বরে পালন করতে পারে রাজ্য সরকার। তবে একথাও তো বলা যায় যে বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সার্ধজন্মশতবর্ষে রাজ্য সরকারের পক্ষে তাঁর প্রয়াণ দিবস ১৬ জুন শ্রদ্ধা নিবেদন করা দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু আদৌ তা পালন হয়েছিল কি? এ ঘটনায় রাজ্য সরকারের দ্বিচারিতার মানসিকতাই প্রমাণ করে। তাছাড়াও স্বাধীনতা দিবস, নেতাজীর জন্মদিন, প্রজাতন্ত্র দিবস ইত্যাদি জাতীয় মর্যাদাপূর্ণ দিনগুলো উদ্‌যাপনের পরের দিনও তো বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের বিশ্রামের জন্য ছুটি ঘোষণা করা দরকার রাজ্য সরকারের? এরকম হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে থাকলে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। তবুও রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয়।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

দাউদ ও ডি-কোম্পানী

মুম্বই আবার রক্তস্নাত। ১৩ জুলাই (১৩/৭) বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ের ব্যস্ততম ও জনাকীর্ণ জাভেরি বাজার, দাদার ও অপেরা হাউস এলাকায় দশ মিনিটের মধ্যে পর পর তিনটি ধারাবাহিক বিস্ফোরণে শতাধিক নিরীহ মানুষ হয়েছেন হতাহত।

১৮ বছর আগে ১৯৯৩ সালে মুম্বইয়ে প্রথম ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটায় রূপালি জগৎ ও অপরাধ দুনিয়ার পান্ডা তথা মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিম। বিস্ফোরণের পর প্রশাসনিক সহযোগিতায় সে পাকিস্তানে পালিয়ে যেতে হয়েছিল সক্ষম। সেই থেকে সে স্থায়ীভাবে পাকিস্তানেই হয়েছে সে দেশের সরকার এবং প্রশাসনের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে। সেখানে বসেই সে যোগসূত্র রচনা করে চলেছে ভারত বিরোধী বিভিন্ন মুসলিম সন্ত্রাসবাদী বা জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে। আলকায়েদার জনক তথা কট্টর ইসলামিক জঙ্গি ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গেও ছিল তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের প্রতিষ্ঠাতা ভাটকল ভাইদের পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে এই দাউদই দিয়েছিল আশ্রয়। তাই ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সঙ্গেও যে দাউদের সম্পর্ক ভীষণ ভালো তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া ২০১০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি পুনের জার্মান বেকারিতে বিস্ফোরণ এবং তার আগে দিল্লি ও জয়পুরের বিস্ফোরণের পিছনে এই জঙ্গি সংগঠনের হাত ছিল বলে তদন্তে জানা গেছে। আবার এই জঙ্গিগোষ্ঠী বিস্ফোরণের জন্য '১৩' তারিখটাকেই বেছে নিচ্ছে। এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। গোয়েন্দারা তাই আই এস আই, দাউদের ডি-কোম্পানি ও পাকপন্থী বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের মদতপুষ্ট ও সাহায্যপ্রাপ্ত ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনকে 'পাখির চোখ' করে এগোচ্ছে। খবরে প্রকাশ, ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর পাক জঙ্গি আজমল কাসভদের মুম্বই হামলা বা ২৬/১১ কাণ্ডেও নাকি ছিল ডি-কোম্পানির কালো হাত। সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা ও আন্তর্জাতিক চোরাকারবারি দাউদ এখন বিশ্বে 'মোস্ট ওয়ান্টেড' অপরাধীদের তালিকায় রয়েছে দু' নম্বরে। ইন্টারপোল তার বিরুদ্ধে জারি করেছে 'রেড কর্ণার এলার্ট'।

এদিকে আই এস আই ও পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলি সন্ত্রাসের কৌশল কিছুটা পাল্টিয়েছে। তারা ভারত থেকে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের জন্য ভারতবিরোধী যুবকদের 'রিক্রুট' করে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে তাদের জঙ্গি প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে ভারতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, ভারতে অন্তর্ঘাত, সশস্ত্র হামলা বা সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ চালানোর জন্য। উদ্দেশ্য, জঙ্গিরা ধরা পড়লে যাতে ভারত বলতে না পারে যে জঙ্গিরা পাক নাগরিক বা পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুলে ভারত বলতে না পারে যে পাক সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তখন পাকিস্তান বড় মুখ করে বলতে পারবে, ভারতে সন্ত্রাসমূলক কাজে পাকিস্তানের কোনও হাত নেই--- ভারতীয়রাই ভারতে সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

সৌরভ গাঙ্গুলীর 'খোদা হাফেজ'

কিছুদিন আগে গত ৮ আগস্ট 'মহুয়া' টিভি-চ্যানেলে 'বাংলার কোটিপতি কে হবে' অনুষ্ঠানটি দেখলাম। সঞ্চালক স্বনামধন্য ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলী। এক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতা প্রশংসনীয়। সমাপ্তি ঘোষণার সময় দু'দিনই 'খোদা হাফেজ' বললেন!

বিদায় সম্ভাষণে নমস্কার, আদাব ইত্যাদি সৌজন্যমূলক শব্দ উচ্চারণের রেওয়াজ আছে। এসব হিন্দু মুসলমান পরস্পরের ক্ষেত্রেও চলে। কিন্তু 'খোদা হাফেজ', 'আসসেলাম আলেকুম' ইত্যাদি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং মুসলমানদের মধ্যেই ওসব সীমাবদ্ধ। আল্লাহ্ বা খোদা শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ঈশ্বর বা ভগবান নয়। মুসলমানরা ঈশ্বরকে কিছুতেই আল্লাহ্ বা খোদা বলে মানতে পারে না কিংবা মানেনও না। সেক্ষেত্রে একজন হিন্দুর 'খোদা হাফেজ' অর্থাৎ খোদা মঙ্গলকারী (ঈশ্বর মঙ্গলকারী নয়) বলার অর্থ ইসলাম মেনে নেওয়া। কিন্তু মুসলমানরা বলেন না, ঈশ্বর মঙ্গলময়। কেননা ইসলামে ঈশ্বরের স্বীকৃতি নেই।

অধিকাংশ হিন্দুর মতোই মনে হয় শ্রী গাঙ্গুলীও এসব জানেন না। হিন্দু অনেকেরই ইসলাম তোষণের মনোভাব প্রবল বলেই তাঁরা এসব বলেন। কিন্তু তোষণের সীমারেখা নেই এবং তোষণের দ্বারা বস্তুতঃ কোনও কাজও হয় না। কথাটা সকলেরই মনে রাখা দরকার।

—কমলাকান্ত বণিক, দত্তপুকুর, উঃ২৪ পরগণা।

ধর্ম ধর্ম খেলা ও এক পরমহংস

অর্ণব নাগ

সাকার ভার্সেস নিরাকার। এহেন দ্বন্দ্বের অবসানে পরমহংসের বক্তব্য— 'সন্ধ্যা করতে করতে সন্ধ্যা গিয়ে গায়ত্রীতে লয় পায়। তেমনি গায়ত্রী জপ করতে করতে গায়ত্রী ওঙ্কারে লয় পায়। তখন সন্ধ্যা আপনি ছেড়ে যায়। তুমি একেবারে নিরাকার ধরবে কি করে? তীরন্দাজ যখন শেখে তখন প্রথমে কলাগাছ বেঁধে, তারপর সরু গাছ, তারপর ফল, তারপর পাতা, তারপর ওড়ক্কা পাখী। প্রথমে সাকার, তারপর নিরাকার।' (স্মৃতিকথা— স্বামী অখণ্ডানন্দ)। সমাজে তখন ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ঘূর্ণিঝড় উঠেছে। ডিরোজিও-র 'ইয়ং-বেঙ্গল' আন্দোলনের যাবতীয় মলিনতা মুছে শিক্ষিত- যুবকদের স্বধর্ম রক্ষায় আশা এবং ভরসা উভয়ই যোগাচ্ছে ব্রাহ্ম-সমাজ। এর কারণ ব্যাখ্যা করে বিবেকানন্দ-অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, 'হিন্দু ধর্ম যে কি, তাহা অনেকেই তখন বুঝিত না। হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে কাহারো বিশেষ কিছু পড়াশুনা ছিল না এবং হিন্দু-ধর্মের বিষয় কোনও গ্রন্থও তখন পাওয়া যাইত না।' সেই ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বর আছে ষোলো আনা। কিন্তু ঈশ্বরীয় অনুসন্ধানে কি কোথাও কোনও খামতি রয়ে গেছে? উত্তরটা খোঁজা অত সহজ নয়। তার আগে অনুসন্ধান করা দরকার ঈশ্বরীয়-খোঁজে ব্রাহ্ম-সমাজের কোন আনাচ-কানাচ ঠাকুরের পদধূলি ধন্য হয়েছে। আমরা জানি, দক্ষিণেশ্বের কালীমন্দিরে অবস্থানকালে ঠাকুর ভক্ত মথুরবাবুর সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থান ঘুরে দেখেন। যার মধ্যে অনেকগুলি ধর্মস্থানও ছিল। কথামৃতে উল্লেখ রয়েছে, ১৮৬৪ সালে কলকাতা ব্রাহ্ম-সমাজে ঠাকুর মথুরাবাবুর সঙ্গে পদার্পণ করেন। আর তারপরেই ছিল সেই বিস্ফোরক মন্তব্য—''কেশব মাঝখানে বসেছে। দেখলাম যেন কাষ্ঠবৎ! সেজোবাবুকে বললুম, দেখ ওর ফাতনায় মাছ খেয়েছে! ওই ধ্যানটুকু ছিল বলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেগুলো মনে করেছিল (মান-টানগুলো) হয়ে গেল।''

তবে ১৮৭৫ সালে বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের বাগান-বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে কেশব সেনের সাক্ষাৎটি আক্ষরিক অর্থেই ঐতিহাসিক, উভয়ের প্রথম মৌখিক পরিচয় সেখানেই। সেই পরিচয় কেশব সেন-কে এতটাই মোহিত করেছিল যে ওই বছরেরই ২৮ মার্চ রবিবাসরীয় 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন— ''আমরা অল্প দিন হইল, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরের বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি, বালকস্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শান্ত-স্বভাব কোমল প্রকৃতি আর দেখিলে বোধ হয় সর্বদা যোগেতে আছেন। এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে, হিন্দুধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য, সত্য ও সাধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। তা না হইলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয়ভাবে ভাবিত যোগীপুরুষ কিরূপে দেখা যাইতেছে?''

আদি ব্রাহ্ম সমাজ : বর্তমানে ভগ্নদশা প্রাপ্ত, জরাজীর্ণ এই পরম পবিত্র গৃহেই প্রথম দর্শনেই ফাতনা ডোবা কেশবচন্দ্র সেনকে চিনে নিয়েছিলেন ঠাকুর। ছবি : শিবু ঘোষ

এ এক ঐতিহাসিক যুগ-সন্ধিক্ষণ। সমাজ-সংস্কার আর ঈশ্বরীয় অনুসন্ধান একে অপরকে আপন করে নিল। ইতিপূর্বে দেবেন ঠাকুরের সমাজে মথুরবাবুর সঙ্গে গিয়ে দেখা হয়ে গেলেও কেশব সেনের হাত ধরে ব্রহ্ম-উপাসনার আনাচে- কানাচে পৌঁছে গেলেন ঠাকুর। ব্রহ্মানন্দ তাঁকে অভিহিত করলেন একটি চমৎকার নামে— 'রামকৃষ্ণ পরমহংস'। একনজরে চোখ বুলোনো যাক কলকাতার কোন কোন ব্রাহ্ম-সমাজ ঠাকুরের পদধূলিধন্য হয়েছে। এক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় গবেষক নির্মল কুমার রায়ের প্রদত্ত তালিকা-ই আমাদের ভরসা—

(১) আদি ব্রাহ্ম-সমাজ

(২) নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজ

(৩) সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ

(৪) সিঁদুরীয়াপট্টী ব্রাহ্ম-সমাজ

(৫) সিঁথির ব্রাহ্ম-সমাজ (বেণী পালের উদ্যানবাটী)

(৬) নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ (কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ি)।

নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজ কেশব সেনের নিজের হাতে তৈরি। এর পেছনে ঠাকুরের প্রেরণা কতটা তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে নববিধানের আদর্শ রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে বহুলাংশে মিলে যায়। শ্রীম-র উক্তি ধার করা যাক—''ওখানে (নববিধান ব্রাহ্মসমাজে) ঠাকুরের দৈবী স্পর্শ রয়েছে। কতবার এসেছেন এখানে। এটি একটি তীর্থ হয়ে রয়েছে। দর্শন করলে উদ্দীপন হয়। কেশববাবুকে কত ভালবাসতেন ঠাকুর। তাঁর ভেতর ঠাকুর উচ্চ উদারভাব ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন নিজে। তাঁর জন্যই নববিধানের ভক্তগণ 'মা, মা' বলে পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন।'' ১৮৭৮ সালে কুচবিহারের রাজবাড়িতে কেশব-কন্যা সুনীতি-র বিবাহ-কে কেন্দ্র করে ঝড় ওঠে ব্রাহ্ম-সমাজে। যার ফলে ১৮৬৬ সালে কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' (Brahmo Somaj of India) দু' টুকরো হয়ে

যায়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখেরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে গড়ে তুললেন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ। অন্যদিকে কেশব সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ নামে সর্বজনসমক্ষে পরিচিত হতে থাকে। মনীষী ম্যাক্সমুলার মনে করেছেন তাঁর পরমহংসের আদর্শকে বুকে ধারণ করেই কেশব সেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আমরা জানি কেশবচন্দ্র ঠাকুরকে 'নববিধানী' (নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত) আখ্যায় আখ্যায়িত করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

বস্তুত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মনেতারা প্রত্যেকেই ঠাকুরের অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে পরবর্তীকালে ঠাকুরের লীলা পার্ষদ বললেও অত্যুক্তি কিছু হয় না। কিন্তু কেশব সেন-ই এক এবং একমাত্র ব্রাহ্ম-নেতা যিনি নিজের সমাজকে ঠাকুরের ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত করতে পেরেছিলেন। এই ব্রাহ্ম-নেতাদের প্রত্যেকের বাড়ি-ই হয়েছিল ঠাকুরের পদধূলি ধন্য। এছাড়াও কলকাতার এদিক-ওদিক গড়ে ওঠা বিভিন্ন ব্রাহ্ম-সমাজেও ঠাকুর গিয়েছেন যার উল্লেখ এই প্রবন্ধের মাঝপথেই হয়েছে। আদি, সাধারণ, নববিধানের মতো কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ি যা নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত, বেণী পালের উদ্যানবাটী অর্থাৎ সিঁথির ব্রাহ্মসমাজ এবং দানবীর

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ : এখানে সান্ধ্য-রবিবাসরীয় একদিনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাই ঠাকুর-স্বামীজীর সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের যোগাযোগ এক অর্থে চিরবিচ্ছিন্ন করে দিয়ে যায়। ছবি : শিবু ঘোষ

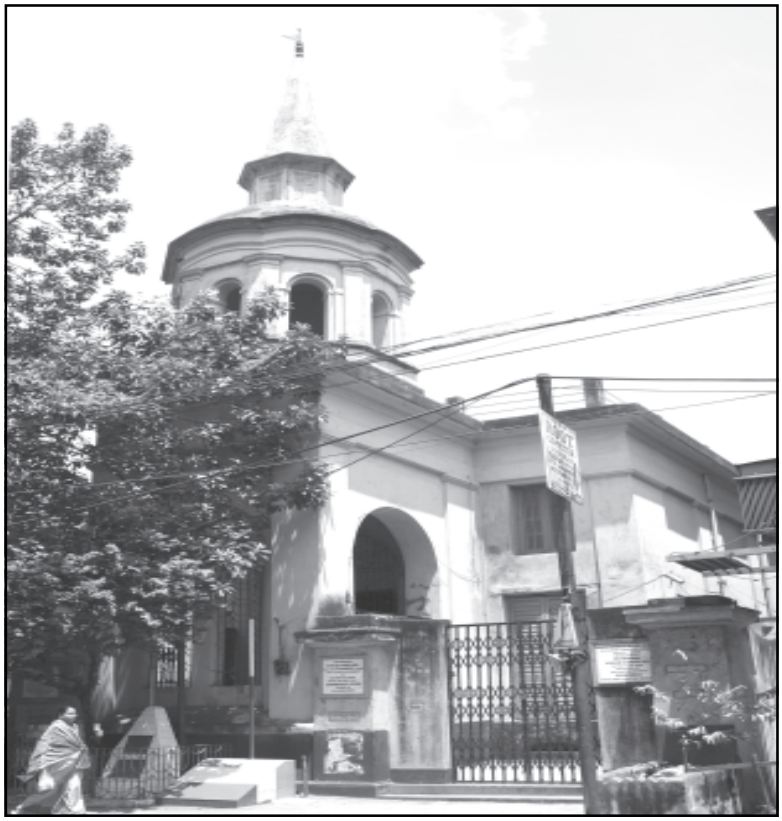

নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ : ঠাকুরের ভাবাদর্শ যে এই সমাজ গড়ে তুলতে কেশবচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল তা আজ সংশয়াতীত ভাবেই প্রমাণিত। ছবি : শিবু ঘোষ।

মণিলাল মল্লিকের বাড়ি যা সিদুঁরীয়া পট্টীর ব্রাহ্মসমাজ (বর্তমানে জৈন মন্দির) হিসেবে খ্যাত সেই সমস্ত স্থানে ঠাকুর পদধূলি দিয়েছেন, সপার্ষদ কীর্তনানন্দে মত্ত হয়েছেন এবং সর্বোপরি বাড়ির বাসিন্দাদের কৃপা করেছেন।

কেশবচন্দ্রের মৃত্যু ঠাকুরকে মর্মাহত করেছিল। 'খেলার পুতুল ভেঙ্গে গেল প্রলয় ঝড়েতে'। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর ঠাকুরের সঙ্গে নববিধানের যোগ ক্রমশ ফিকে হতে থাকে। আর ঠাকুরের মৃত্যুর পর নববিধানীদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ শিষ্যদের দূরত্বের কথাও কারুর অজানা নয়। তবে ঠাকুর তাঁর জীবিতাবস্থাতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে অসম্মানের সামনে পড়েছিলেন, তা এতবছর বাদেও সংবেদনশীল পাঠককে ব্যথিত করে। আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই, যাঁর কাঁধে জগতের গুরুভার তিনি চাপিয়ে দিয়েছিলেন, একদা ব্রাহ্মসমাজের সদস্য সেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত (উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ) গুরুর অপমানের ভার সইতে না পেরে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে চিরদিনের মতো যোগাযোগ ছিন্ন করেছিলেন। সেদিনের বেদনাদায়ক বর্ণনা 'বিবেকানন্দ চরিত' গ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কলমে— ''অনেকদিন নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। সেদিন রবিবার, ব্রাহ্মসমাজে গেলে নিশ্চয়ই নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন, এই আশায় ঠাকুর সন্ধ্যাকালে সাধারণ সমাজের উপাসনায় উপস্থিত হইলেন। আচার্য তখন বেদী হইতে বক্তৃতা করিতেছিলেন। ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণে ভাবোন্মত্ত ঠাকুর অজ্ঞাতসারেই বেদীর সমীপবর্তী হইলেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের আগমনের কারণ অনুমান করিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া পতনোন্মুখ ভাবময় দেহখানি ধারণ করিলেন, কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, পরমহংসকে সম্মুখে দেখিয়া বেদীতে উপবিষ্ট আচার্য গাত্রোত্থান করা তো দূরের কথা, তিনি বা অন্যান্য ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে সম্ভাষণও করিলেন না এবং সাধারণ ভদ্রতাসূচক শিষ্টাচারও প্রদর্শন করিলেন না। অনেকের মধ্যে অবজ্ঞাবিমিশ্র বিরক্তির চিহ্নই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য অনেকেই আগ্রহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, ফলে উপাসনালয়ে বিশৃঙ্খলা কোলাহল দেখিয়া কর্তৃপক্ষ গ্যাসালোকগুলি নিবাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র বহুকষ্টে মন্দিরের পশ্চাৎদ্বার দিয়া ঠাকুরকে বাহিরে আনিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের পাঠাইয়া দিলেন। ঠাকুরের প্রতি ব্রাহ্মগণের এইরূপ ব্যবহারে তিনি হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইলেন এবং তাঁহারই জন্য ঠাকুর একপ্রকার লাঞ্ছিত হইলেন দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত নরেন্দ্র আর কখনও ব্রাহ্মসমাজে যান নাই।'' নির্মল কুমার রায়ের সিদ্ধান্ত— 'অর্থাৎ সেইদিনই ঠাকুর ও স্বামীজী'র একইসঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে শেষ আগমন।'

সাঙ্গ হ'ল তবে ধর্ম-ধর্ম খেলা?

রিউম্যাটিক বা আর্থারাইটিস

ডাঃ আর এন দাস

এই রোগটা অল্প বয়সেই শুরু হয়ে যায়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশি। ঠাণ্ডা দেশে অর্থাৎ ইউরোপ আমেরিকায় ককেশীয়দের মধ্যে এর প্রভাব বেশী দেখা যায়। তবে আমাদের মতো গরমদেশেও অনেক মা-বোনেরা হাতের গাঁট ফোলা ও যন্ত্রণা নিয়ে কাতরাতে কাতরাতে আমাদের কাছে আসেন। আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় হলো আর্থসামাজিক পরিস্থিতি। আর্থিক কারণে গরীব মানুষ ভালো Rheumatolosist-এর কাছে যেতে পারে না। দীর্ঘস্থায়ী, দামী ওষুধ খেতে পারেন না। সময় মতো উপযুক্ত পরিমাণ বিশ্রাম পান না। সংসারের চাপে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে শুধুমাত্র ব্যথার ওষুধ খেয়ে সাময়িক উপশম হলেও একাধিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে আমাদের কাছে যখন তারা এসে পৌঁছায় তখন রোগটা অনেকদূর পৌঁছে গেছে। হয় ততদিনে Gastric ulcer বা কিডনির অসুখে ভুগছেন।

কাদের হয়? সাধারণ ভাবে ২০-৪০ বছরের মেয়েদেরই বেশি হয়। তবে আমার দেখা ৩ বছরের ছোট্ট মেয়ে দার্জিলিং-এর লিপিকা বার্মার (নাম গোপন রাখা হয়েছে) নামও উল্লেখনীয়। আবার আমি কলকাতার এক মাসীমাকে জানি যার প্রথম অ্যাটাক্টটা শুরু হয় ৬০ বছর বয়সে। পুরুষ মানুষের তুলনামূলকভাবে কম হয়।

লক্ষণগুলো কি?

(১) সকালে ঘুম থেকে উঠলেই সারা শরীর আড়ষ্ট লাগে। তারপর রৌদ্র ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই আড়ষ্ট ভাব কাটতে থাকে ধীরে ধীরে। সকালে সব থেকে বেশী, সন্ধ্যায় সব থেকে কম ব্যথা। (২) দুই হাতের ছোট ছোট জয়েন্টগুলো (হাতের আঙুল ও কব্জির) সমানভাবে ব্যথা, ফুলে যাওয়া, গরম হয়ে যাওয়া ও জয়েন্টগুলোর normal movement-এর ব্যাঘাত ঘটা (৩) হাতের কনুই বা কব্জির উপরিভাগে nodule বা synovial Thickening (৪) X-ray বা MRI এ অস্থিসন্ধির ক্ষয় ও (৫) Rheumafoid Factor আছে কিনা তার জন্য রক্তের পরীক্ষা।

কেন হয়? কারণগুলি কি? এর উত্তর চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখনও ভালভাবে জেনে উঠতে পারেননি। ইংল্যান্ড/আমেরিকায় এর উপর এত বেশি অনুসন্ধান চলছে যে কোটি কোটি হাজার ডলার বা পাউন্ড খরচ করছেন এক একটা ওষুধ কোম্পানী। কেউ বলেন, ভাইরাস, কেউ বলেন Genes. কেউ বলেন আবহাওয়া বা পরিবেশ— অর্থাৎ কিনা একাধিক কারণের সম্মিলিত ফলস্বরূপ— Rheumatoid Arthrites-এর মতো Chronic Deforming Polyarthrite সৃষ্টি হয়। জানেন, এর অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলেন। কেন না এর সত্যি কোন Permanent Cure নেই। শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ করা যায় এর ব্যথাটাকে এবং এর জয়েন্টের

Destructive Erosion-কে। মা-মাসী বাবা-কাকা- জেঠার Rheumatoid Arthritis হলে, ভাই-বোনের RA হলে— নিজের RA হবার প্রবণতা বেশি থাকে। Autoimmune Hypothisis হলে Thyroid। Addisions Disehtr ইত্যাদি হলে HisDR 3, DRA যাদের আছে—তাদের RA হবার প্রবণতা বেশি হয়।

ডাইগোনিসিস : লক্ষণগুলো উপযুক্ত Training পাওয়া Rheumatolo-gist-রা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিচার করেন। যদি উপরিউক্ত লক্ষণগুলি কারুর শরীরে প্রকাশ পায় যা X-ray এবং রক্তপরীক্ষার সঙ্গে মিলে যায় তবে সহজেই এর Diagnosis করা যায়। একবার ডাইগোনেসিসটা ঠিক হয়ে গেলে খুব সহজেই উপশম বা উপকার করা যায়। আজকাল তো ইন্টারনেটের যুগ। Google Search-এর অসীম জ্ঞানের সমুদ্র থেকে যে কেউই এই দীর্ঘস্থায়ী রোগের লক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখতে পারেন। তবুও বলবো একজন উপযুক্ত ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কোন ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

আর এ শুধুমাত্র যে জয়েন্ট-কেই আক্রমণ করে— তা নয়। এর পরিধি বিস্তৃত সারা শরীরে। অন্ত্র, হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, নার্ভ, হাড়ের মজ্জা, রক্ত, কিডনি— যে কোনও অঙ্গকেই আক্রমণ করতে পারে। তাই ওই সব অঙ্গের পরীক্ষা নিরীক্ষাও জরুরী হয়ে পড়ে। রোগ বা রোগের জন্য ব্যবহৃত ওষুধপত্র— দুটোই সারা শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার জন্যই বিভিন্ন প্রকার ল্যাবরেটরি পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

উপকার বা উপশম : (ক) লাইফস্টাইল মডিফিকেশন : (১) খাওয়া দাওয়ার নিয়ন্ত্রণ, ওজন কমানো (সেটা হলে) : রোগ হলে ওজন বাড়ানো। আমার স্থূলকায় রোগীণীরা এ লেখা পড়ে নিশ্চয় হাসাহাসি করছেন। টক জিনিস খেতে বারণ করি কেননা অ্যাসিডিটি বাড়ে যা পাকস্থলির ক্ষতি করে। (২) বেশী শাকসব্জি খাওয়া উচিত, পালং শাক খেলে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ে না এটা জেনে রাখুন। মাছ, মাংস, মদ বেশী পরিমাণে খেলে। (৩) সিগারেট খেলে Osteoporosis হয়। আর স্থানীয় জয়েন্টগুলোর পার্শ্ববর্তী হাড়ের মধ্যে এর প্রকোপ দেখা যায়। তাই হাড়গুলো ক্ষণভঙ্গুর হয়।

(খ) মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট : (১) NSAIDS (non-stenidal Anti Inflammetory Drugs) ব্যথার জন্য খাওয়ায়, লাগানোর ও ইনজেকশন দেওয়া হয় বিভিন্ন ওষুধের মাধ্যমে। (২) DMRRDS পাওয়া যায় যা কিনা রোগের গতিকে প্রতিহত করে। (Disease modifying anti-rheumatic drugs) এটা কিন্তু কিছুটা বিষ জাতীয় ওষুধ। গর্ভবতী অবস্থায় এসব ওষুধ অপ্রযোজ্য। মেথোট্রেক্সেট (methofrexate) : Gold injection অথবা মুখে খাওয়া ট্যাবলেট, Hydroxychloroqun; Penicillamin : Leflunomide : Infliximab : Sulphasalazine ইত্যাদি (৩) Steroid : এই গ্রুপের ওষুধ ভীষণ প্রয়োজনীয়। মুখে খাওয়া যায়, লাগান যায়, মাংস পেশী বা জয়েন্টের মধ্যে ইনজেকশন দেওয়া যায়।

(গ) ফিজিওথেরাপী : (Wax bath) ; Shortwave diatdherapy : Infrared ray বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম। গরম জলের সেক : Hydrotherapy ইত্যাদিও প্রতিটি রুগীর জন্য নিয়মিত ভাবে প্রয়োজনীয়।

(ঘ) Surgery : নানা ধরনের অপারেশন সার্জেনরা রুগীর প্রয়োজন অনুযায়ী করেন। Tendon Replacemende, Synovectomy : Joint Prosthesis : বিভিন্ন প্রকার Nerve Decompression ইত্যাদি; পশ্চিমী দেশগুলিতে হাঁটু এবং কুঁচকির জয়েন্টের অপারেশনের জন্য প্রতি বছর লম্বা লাইন দিতে হয়। আমাদের মতো গরীব দেশেও অনেক সময় ওইসব অপারেশন চালু হয়েছে।

(সম্পর্ক সূত্র : ৯৯৩৩৪২০৭৬৮)

নারীর ক্ষমতায়ন

প্রীতি বসু

ভারতীয় সংবিধানে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। আবার তুল্যমূল্যভাবে দেখলে দেখা যায় মেয়েদেরই একটু বেশি সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে—সরকার সবাইকে আইনি নিরাপত্তা লাভের সমান সুযোগ দেবে। লিঙ্গের ভিত্তিতে সরকার কোনও নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করবে না। মহিলাদের সপক্ষে ও সুবিধার্থে বৈষম্যমূলক পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের সংস্থানও রাখা হয়েছে। সরকারী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য যাতে না হয় তার কথাও বলা হয়েছে। সংবিধানে এও বলা হয়েছে যে মেয়েদের কাজের জায়গায় উপযুক্ত মান ঠিক পরিবেশ ও মাতৃত্বের পক্ষে সবরকম সুবিধা সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। আবার এও বলা হয়েছে যে মেয়েদের পক্ষে অবমাননাকর সবরকম আচার আচরণ বর্জন করা যে কোনও নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য।

এসবগুলোই মৌলিক অধিকারের আওতায় পড়ে। কাজেই কোনও মহিলা যদি বৈষম্যের স্বীকার হন, তবে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। যে সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের ঐতিহ্যগত বৈষম্যের প্রবণতা রয়েছে— সেগুলিকে রোধ করবার জন্য বিশেষ আইন প্রণীত হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে— বিবাহ, মাতৃত্ব, শিশু, গর্ভপাত, নারীঘটিত অপরাধ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার। বর্তমান যুগের মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে যেমন নিজেদের স্থান করে নিয়েছে, তেমনি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে। গ্রাম পরিষদে আজ নির্বাচিত মহিলার সংখ্যা কম নয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন একজন মহিলা। ওঁকে ধরে বড় বড় ছয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদ মহিলারা অলংকৃত করছেন। বর্তমান ইউ পি এ সরকারের সম্মানীয় চেয়ারপার্সন একজন নারী। রাষ্ট্রপতি পদেও একজন নারী আসীন রয়েছেন। বহুক্ষেত্রেই মন্ত্রী ও অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে মহিলারা রয়েছেন। একটু পিছন ফিরে দেখলেই দেখা যায়—দশ বছর ধরে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন।

দেশের মধ্যে রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। ভারতীয় সংবিধান প্রথম থেকেই মেয়েদের পুরুষদের সমান অধিকার দিয়েছেন। তবে এদেশের অনেক মেয়েই সংবিধান প্রদত্ত এই সকল অধিকারের কথা জানেন না। কারণ, তাঁদের অশিক্ষা ও কুসংস্কার।

মেয়েদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করবার জন্য অনেক পরিকল্পনা, অনেক ভাবনাচিন্তা চলছে। যাঁরা এইসব পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বে আছেন, তাঁরা এমন একটা

উপায় বার করুন, যার ফলে মহিলারা নিজেরাই ঠিক করতে পারেন, কোনটা তাঁদের ভালো এবং কোন পরিবর্তনটা তাঁদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ক্ষমতায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতিবন্ধী নারীদেরও বিভিন্ন সমস্যার দিকে সচেতন ও সজাগ দৃষ্টি রাখা অবশ্যই মূল কর্তব্য।

উপরোক্ত নারীদের ক্ষমতায়নের পথে প্রধান বাধা বাইরে বেরিয়ে এসে জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভের সুযোগের অভাব। এর সঙ্গে মূলত জড়িয়ে রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ। এছাড়াও চিরাচরিত কুসংস্কার আত্মবিশ্বাসের অভাব, তাঁদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকা, আইন-কানুন সম্পর্কে ধ্যানধারণা না থাকা প্রভৃতিগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত তাঁদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর্থিক স্বনির্ভরতা না থাকা। এসকল অসুবিধার ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন যে তাঁদের সহায়তা করতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন সমাজসেবী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে শহর ও গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে গিয়ে সকল স্তরের নারীদের মধ্যে প্রচার অভিযান চালাতে হবে ও তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলবেন ও উজ্জ্বল আলোর সন্ধান পাবেন।

বনবন্ধু পরিষদের (কলকাতা) বার্ষিক উৎসব

বনবন্ধু পরিষদের অনুষ্ঠানে মঞ্চাসীন বিশিষ্ট অতিথিগণ।

''বনবাসী-জনজাতি সমাজের প্রায় ৯ কোটি ভারতবাসীর সার্বিক উত্থানে সদাসক্রিয় বনবন্ধু পরিষদ (Friends of Tribal Society)। এই বনবাসীরা অশিক্ষা, কুসংস্কার ও দারিদ্র্যের শিকার। একল বিদ্যালয়ের প্রকল্পের (ওয়ান টিচার স্কুল) মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাবলম্বন ও স্বাভিমান জাগরণের উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে বনবন্ধু পরিষদ। একটি গ্রাম, একটি বিদ্যালয়, একজন শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী ২৫/৩০ জন। সম্পূর্ণ দায়িত্ব বনবন্ধু পরিষদের। এসময় সারা ভারতে ৩৪,৫২২টি বিদ্যালয়ে (প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণী) মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার।''

উপস্থিত হলভর্তি শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে এভাবেই স্বল্প সময়ে বনবন্ধু পরিষদ-এর কাজ সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন সভাপতি (কলকাতা শাখা) সজ্জন বনসল। শ্রী বনসল আরও জানান, আর মাত্র তিন বছরের মাথায় বনবন্ধু পরিষদের রজত জয়ন্তী। তার মধ্যে সারা দেশে এই একল বিদ্যালয়ের সংখ্যা এক লক্ষ হবে। এটাই পরিষদের আগামী লক্ষ্য। একল বিদ্যালয়কেই সরকার মডেল হিসেবে নিয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান চালাচ্ছে। একল বিদ্যালয়ের কাজ সরকারের দাক্ষিণ্য ব্যতিরেকেই চলছে।

বনযাত্রা, সংস্কার কেন্দ্র এবং ১৬টি ভিডিয়ো রথ (চলমান প্রদর্শনী)-এর মাধ্যমেও শ্রদ্ধা জাগরণের কাজ চলছে। যাতে এদেশের বনবাসী সমাজ নিজেদের দেশ, সমাজ ও দেবতা (ভগবান) বিষয়ে ওয়াকিবহাল হন, বিদেশীদের খপ্পরে পড়ে দেশবিরোধী সমাজবিরোধী না হন। বনযাত্রায় শহরবাসী নগরবাসীরা বনাঞ্চলে গিয়ে বনবাসীদের সঙ্গে একত্র মিলিত হন। সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যেকার ব্যবধান, দূরত্বের অবসান হয়। পরিশেষে শ্রী বনসল এই মহান কাজে কলকাতাবাসীদের সবরকম সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি চন্দ্রকান্ত ধানুকা। তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন, বনবন্ধু পরিষদের কাজে তিনি সদাসর্বদা যুক্ত থাকবেন। কেননা, শিক্ষার মাধ্যমে অন্ধকার দূর হয়।

চন্দ্রমোহনজীর তথ্যচিত্রের মাধ্যমে (পাওয়ার প্লে প্রেজেন্টেশন) বনবন্ধু পরিষদের কাজের বিস্তারিত বিবরণ চিত্রসহ সবার সামনে তুলে ধরেন। বনবন্ধু পরিষদের কাজের কারণে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্কুলছুটের হার কমছে। বনবাসী শিশু, বালক-বালিকারাও সংস্কৃত ও ইংরেজী শিখছে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তী সময়ে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রকাশজী চন্দালিয়া এবং শেষে ধন্যবাদ জানান পরিষদের সংযোজক সুভাষ মুরারকা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাঙ্গীলাল জৈন, সজ্জন ভজনকা, রমেশ সারওগী এবং সত্যনারায়ণ দেওরালিয়া। শেষে মুম্বাই আগত কলাকুশলীদের অদ্ভুত মনোমুগ্ধকর নৃত্যনাটিকা ''অথবারো রাধেশ্যাম নো'' দর্শক শ্রোতৃবৃন্দের অন্তর আনন্দভক্তিতে প্লাবিত করে। জন্মাষ্টমীর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে বিভিন্ন ঘটনা সামূহিক নাচ-গান ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পরিবেশিত হয়। হীরেন পরপানী প্রোডাকসন্সের প্রস্তুতি ও তুলসী যোশীর ভাষ্যপাঠ প্রশংসনীয়।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির বার্ষিক সভা

গত ২০ আগস্ট উত্তর ২৪ পরগণার কর্ণমাধবপুর বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের সভাকক্ষে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে গেল। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে সভার সূচনা হয়। ২০১০-১১ আর্থিক বর্ষের সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হয়। সেইসঙ্গে এই আর্থিক বর্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং সমিতির ব্যালেন্সসীট ও অডিটরের রিপোর্ট সভায় পেশ করা হয় এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

সভার দ্বিতীয় পর্বে সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সজল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ২০১১-১২ বর্ষের জন্য কার্যকরী সমিতির নির্বাচন হয়। বিভিন্ন পদে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় তাদের মধ্যে রয়েছেন—সভাপতি : বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি : তপন নাগ, সম্পাদক : জীবনময় বসু, সহ সম্পাদক : তপন গাঙ্গুলী এবং সদস্য—অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিজয় আঢ্য ও তরুণ কুমার পণ্ডিত।

উল্লেখ্য, এই বৎসরে সমিতি ২০ জন ছাত্রছাত্রীকে মোট ২২,৩৭০ টাকা স্টাইপেন্ড, বিদ্যার্থী পরিষদকে ৪৮০০০ টাকা গ্রন্থ মঞ্জুরী (বুক গ্র্যান্ট), বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য বাবদ ৩৬,৩৪০ টাকা এবং বিভিন্ন সংগঠনকে ২২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছে। গত ৪৮ বছর ধরে নীরবে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সমিতি এই যে সেবা কাজ করে চলেছে তা প্রশংসার দাবী রাখে। প্রথমে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও ত্রাণ নিয়ে এই সমিতি গঠিত হলেও এখন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেই সমিতি সেবা কাজ করে চলেছে।

মালদায় ১৮ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস

গত ১৮ আগস্ট পালিত হয়ে গেল মালদা জেলার স্বাধীনতা দিবস। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলেও মালদা জেলা স্বাধীন হয় তার তিন দিন পর ১৮ আগস্ট। স্বভাবতই দিনটি জেলাবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি বছর মালদা শহরে বিভিন্ন স্থানে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। এবারও ১৮ আগস্ট বাবুপাড়া ও জেলার অন্যান্যস্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এদিন বাবুপাড়াতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এলাকার প্রবীণ নাগরিক রঘুনাথ কর্মকার।

স্থানীয় বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক কমল বসাক বলেন, ১৯৪৭ সালে সারা দেশ স্বাধীনতা দিবস পালন করলেও মালদা জেলা সেই সময় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পাকিস্তানের পতাকা লাগানো ছিল। মালদা জেলার ১৫টি ব্লক পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে এই খবর ১৪ আগস্ট চাউর হতেই সারা জেলা জুড়ে শুরু হয়েছিল উত্তেজনা ও উদ্বেগ। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি মালদার মানুষ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা ছাড়াও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছুটে যান কলকাতাতে। তারা লিখিতভাবে জানান যে মালদা জেলা মুসলিম অধ্যুষিত বলে দাবী করলেও আসলে এটা হিন্দু প্রধান। অবশেষে তিন দিন পর ১৮ আগস্ট মালদা জেলার ১৫টি ব্লকের মধ্যে ১০টি ব্লক ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়। বাকী ৫টি ব্লক চলে যায় পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশের মধ্যে। ১৮ আগস্ট মালদা কালেক্টরের বিল্ডিংএর সামনে তেরঙা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে ছুটে আসেন তৎকালীন পাবনা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক মঙ্গল আচার্য। এই দিনটিতেই স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করেন মালদার জনগণ। ১৭ আগস্ট রেডিওতে ঘোষণা করা হয় মালদা জেলার ১১টি ব্লক হিন্দুস্থানে এবং ৫টি থানা অর্থাৎ নারোল ভোলাহাট, নবাবগঞ্জ ও শিরগঞ্জ থানা যাচ্ছে পাকিস্তানে। এদিন বালুরঘাটেও এই একই কারণে বিজেপি-র পক্ষ থেকে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্যই মালদা জেলার ১০টি থানা সেদিন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

মুন্সীরহাটে কেরিয়ার গাইড অনুষ্ঠান

হাওড়া জেলায় জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মুন্সীরহাট অঞ্চলে ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতার প্রয়াণ দিবসসহ রাখীবন্ধন ও কেরিয়ার গাইডের অনুষ্ঠান হয়। উদ্যোক্তা বিবেকানন্দ শিশুমন্দির ও ব্রাহ্মণপাড়া চিন্তামণি ইনস্টিটিউশন।

৫০০ জন ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে জে. বি. পুর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ কাসেম মোল্লা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারক শ্যামাচরণ রায় সরস্বতীমাতা ও ভারতমাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। কেরিয়ার গাইড প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক দীপক গাঙ্গুলী, আইনজীবী জ্যোতিপ্রকাশ রায়, শিক্ষক লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, চিন্ময়কুমার (প্রধান শিক্ষক), ইঞ্জিনিয়ার ব্রজরাখাল চ্যাটার্জী প্রমুখেরা।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শুভেন্দু সরকার।

বড়বাজার লাইব্রেরির আলোচনা সভা

বড়বাজার লাইব্রেরি দ্বারা আয়োজিত ভাঁওয়রলাল মল্লাবত ব্যাখ্যানমালা কার্যক্রমে মঞ্চে উপস্থিত (বাঁ দিক থেকে) মহাবীর বাজাজ, হৃদয়নারায়ণ দীক্ষিত, রাজীব হর্ষ, বিমল লাঠ, যুগলকিশোর জৈথলিয়া (ভাষণরত)।

গত ১৭ আগস্ট সকালে বড়বাজার লাইব্রেরির উদ্যোগে আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভা হয়ে গেল। কর্মযোগী ভাঁওরলাল মল্লাবত-এর স্মৃতিতে আয়োজিত এই সভায় আলোচনার বিষয় ছিল সম্প্রতি 'এন এ সি'-র প্রস্তাবিত 'প্রিভেনশান অফ কম্যুনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল'। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী হৃদয়নারায়ণ দীক্ষিত, রাজস্থান পত্রিকার স্থানীয় সম্পাদক রাজীব হর্ষ, যুগল কিশোর জৈথলিয়া, বিমল লাট প্রমুখ বিষয়টির বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করে বলেন, বিলটি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু নিধন বিল এবং এই বিল আইনে পরিণত হলে তা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আঘাত করবে।

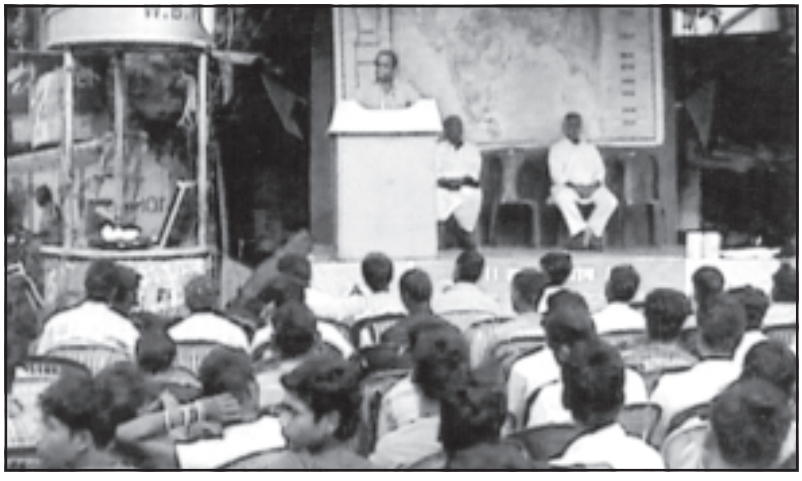

ক্যানিং-এ হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সংকল্প দিবস

হিন্দুজাগরণ মঞ্চের ক্যানিং মহকুমা সমিতির উদ্যোগে ১৪ আগস্ট ক্যানিং-এ সারাদিন ব্যাপি অখণ্ড ভারত সংকল্প দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়। সেখানে ১০০ জন যুবক রক্তদানের জন্য উপস্থিত থাকলেও মাত্র ৫৮ জনের রক্ত নেওয়া সম্ভব হয়।

বিকেলে সভায় বক্তব্য রাখেন মঞ্চের প্রান্ত সংযোজক দিলীপ কুমার ঘোষ, দুই বিভাগের সংগঠন সম্পাদক বিশ্বনাথ সাহা। সভাপতিত্ব করেন মানিক দাস। স্থানীয় বাজারের বহু ব্যবসায়ী এবং নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চের প্রায় ২০০ কর্মী সারাদিন কর্মব্যস্ত ছিলেন।

রায়গঞ্জে অখণ্ড ভারত দিবসে আলোচনা সভা

গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রায়গঞ্জে ''ওয়েস্ট দিনাজপুর চেম্বার্স অফ কমার্স ভবন''-এ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে অখণ্ড ভারত দিবস পালন করা হয়। সেই সূত্রে এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন সভার সভাপতি অধ্যাপক নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী, স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য, অধ্যাপক উৎপলেন্দু সরকার, সঙ্ঘচালক বিজয় তালুকদার, দিনাজপুর বিভাগ প্রচার প্রমুখ অপূর্ব দাস। ক্ষুদে শিল্পী (জি টিভি) অভিরূপ চক্রবর্তী উদ্বোধনী সংগীতের পর শ্রী তালুকদার স্বাগত ভাষণ দেন। হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির উদারতার কথা ব্যাখ্যা করে কিভাবে রাজনৈতিক তথা দেশবিরোধী চক্রের শিকার হচ্ছে, ডঃ আঢ্য সেই বিষয়টি তুলে ধরেন। মুক্ত প্রশ্নমঞ্চের ১ম, ২য়, ৩য়-দের পুরস্কৃত করা হয়।

জাঙ্গিপাড়ায় ভারতমাতা পূজা

জাঙ্গিপাড়া খণ্ডের বোড়হল গ্রামে একাত্ম মানববাদ সঙ্ঘের পরিচালনায় ভারতমাতা পূজা অনুষ্ঠিত হয় ১৫ আগস্ট। ১৬ আগস্ট তিন হাজারজনের নরনারায়ণ সেবার আয়োজন হয়েছিল এবং বিকালে অখণ্ড ভারত সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সংস্কৃত ভারতীর সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। সভাপতি ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি নীলমণি দলুই। সেই সঙ্গে সকলের হাতে রাখিও বাঁধা হয়।

জালাবেড়িয়াতে জলাভিষেক উৎসব

গত ১৫ আগস্ট ওই দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলারই জালাবেড়িয়া হিন্দু বিদ্যালয়ের 'রামেশ্বর শিব' মন্দিরে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তত্ত্বাবধানে ভগবান মহাদেবের জলাভিষেক হয়। এই অনুষ্ঠানে জালাবেড়িয়া অঞ্চলের প্রায় ৫ হাজার শিবভক্ত জলাভিষেক করেন।

হালিশহরে দুর্নীতি বিরোধী পথসভা

গত ২১ আগস্ট হালিশহর চৌমাথা বাজার-এ আন্না হাজারে ও স্বামী রামদেবজীর দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে একটি পথসভা হয়। পরিচালনায় রাম প্রসাদ মঠ ও মিশন এবং স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন অসিত আইচ, প্রধান অতিথি ছিলেন অশ্বিনী জয়সওয়াল এবং সভাপতি ছিলেন স্বামী আগমানন্দজী মহারাজ।

শহীদ চুরকা মুর্মুর স্মৃতি সৌধকে হেরিটেজ ঘোষণার দাবী

শহীদ চুরকা মুর্মুর স্মৃতি সৌধটিকে 'হেরিটেজ' হিসাবে ঘোষণা করার দাবী জানাল চুরকা মুর্মু স্মৃতি সমিতি। যে বীরের নীরব আত্মদানে বাংলাদেশের সৃষ্টি ও ৭১-এ যুদ্ধে জয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কেন্দ্র বা রাজ্যের বাম সরকার কেউই উদ্যোগ নেয়নি। এটা লজ্জার। চুরকা মুর্মু স্মৃতি সমিতির আয়োজিত সভায় এই বেদনার কথাটাই উঠে এলো।

গত ১৭ আগস্ট বিকেলে বালুরঘাটে জয়চাঁদলাল প্রগতি বিদ্যাচক্র উচ্চ বিদ্যালয় বীর শহীদ চুরকা মুর্মু স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে ২২তম স্মৃতিবাসর অনুষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন চুরকা মুর্মু। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্য, সমিতির সম্পাদক বিনয় বর্মন, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম সরকার প্রমুখ। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিত ঘোষ বলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর ইতিহাসের পাতায় চুরকা মুর্মুর ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন আছে। ডঃ আঢ্য বলেন, চুরকা মুর্মু এই বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে গর্বিত ঠিকই, কিন্তু চুরকা মুর্মুর আত্মবলিদানে দেশের প্রতিটি লোক গর্বিত হবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অসীম ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন—তাদের বিদ্যালয়ে চুরকার প্রতিমূর্তি স্থাপিত হবে। সবশেষে বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর দুই কৃতি ছাত্র-ছাত্রী পরিমল টুডু ও লিপিকা মুর্মুকে সমিতির পক্ষ থেকে বীর চুরকার স্মৃতি রক্ষণার্থে মেধাবৃত্তি পুরস্কার দেওয়া হয়।

পরের দিন বিকালে চকরাম গ্রামেও শহীদ চুরকা মুর্মুর স্মৃতিতে প্রতি বছরের মতো এবছরও অনুষ্ঠান হয়। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে ১৮ আগস্ট তৎকালীন খান সেনাদের আক্রমণ রুখতে গিয়ে চুরকা নিহত হন। চুরকা ওই সময় তার গ্রামের শাখার মুখ্য শিক্ষক ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। চুরকার স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ সহ প্রচার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সঙ্ঘচালক যোগেন মাহাত।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বনগাঁ নগর কার্যবাহ কল্যাণ দাসের পিতা নির্মল কুমার দাস গত ২ আগস্ট পরলোক গমন করেছেন। বনেদী বেহালার নূতন দল ক্লাবের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন।

***

গত ২২ জুলাই বাগবাজারে প্রবীণ স্বয়ংসেবক হারাধন চট্টোপাধ্যায় ৯৩ বছর বয়সে স্বর্গবাস করেন। তাঁর ১ ছেলে ও ২ মেয়ে বর্তমান। উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালে সংঘের ওপর নিষেধাজ্ঞার সময় হারাধনদা কারাবাস করেন।

মেসি ম্যাজিকে ভারতীয় ফুটবলের কি এল-গেল?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭৭-এ সম্রাট পেলের ক্লাব কসমস এসে খেলে গিয়েছিল ইডেন গার্ডেনে মোহনবাগানের সঙ্গে। তাতে বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের কি লাভ হয়েছিল? যারা পেলে, আলবার্তো, কিনালিয়ার সঙ্গে খেলার সুযোগ পেয়েছিল সেই মোহনবাগান ফুটবলাররা অবশ্য আবেগ, অনুভূতির চরম নেশায় বুঁদ হয়ে বেশ ক'দিন রাতে ঘুমোতে পারেননি, এই পর্যন্ত। কসমস ক্লাবের প্রশাসন, পেশাদারি শৃঙ্খলাবদ্ধ দায়বদ্ধতা দেখে এদেশের ফুটবল সংগঠকরা কতটা শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার কোনও খবর পাওয়া যায় না। না হলে মহারাষ্ট্রের জিয়াউদ্দিন, বাংলার অশোক ঘোষের পরিচালনাধীন এ আই এফ এফ পরবর্তীকালে ভারতীয় ফুটবলকে টেনে তুলতে

পারলেন না কেন? নেহরু কাপের মতো আন্তর্জাতিক মানের ফিফা স্বীকৃত টুর্নামেন্ট আয়োজন করেও।

তাও তখন জিয়াউদ্দিন, অশোক ঘোষ বা বেঙ্গালুরুর বিশ্বনাথনের মধ্যে একটা সৎ-প্রচেষ্টা ছিল। হয়ত নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও সামাজিক স্ট্যাটাস অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল প্রশাসনে থেকে। তার মধ্যে কিছুটা হলেও ভারতীয় ফুটবলের জন্য গঠনমূলক কাজ করেছেন দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনে। যেমন নেহরু কাপের আয়োজন, এশিয়াডের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও বিদেশে একাধিক টুর্নামেন্ট খেলা এরকম। তাই তাদের আমলে ভারত মারডেকার সেমিফাইনালে খেলেছে। নেহরু কাপে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে ও পোল্যান্ডের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়েছে। এরপর প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির জমানায় নেহরু কাপ বন্ধ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলাও অনেক কমে যায় ও এশিয়স্তরেই অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায় ভারত।

আর এখন প্রফুল্ল প্যাটেলের এ আই এফ এফের

লক্ষ্য জাতীয় ফুটবল দলটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ও সর্বস্তরে ফুটবল খেলাটার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটানো। তাই মেসি আগুইয়েরার আর্জেন্টিনা-ভেনিজুয়েলা ম্যাচ ঘিরে জনমানসে যতই উদ্দীপনার সঞ্চার হোক, তাতে গ্রামবাংলার উদীয়মান কিশোর ফুটবলার থেকে রাজ্য, জাতীয়স্তরের ফুটবলারদের কোনও উন্নতি হবে না।

প্রায় তিন বছর আগে বিশ্ব ফুটবলের 'দেবদূত' দিয়েগো মারাদোনা এসে সল্টলেক স্টেডিয়াম ও মোহনবাগান মাঠে তার 'জাদু' দেখিয়ে গেছেন। তাতে লক্ষাধিক দর্শক মাতোয়ারা হয়েছেন ও দু-একদিনের মধ্যেই সবাই সব ভুলে গেছেন। তার আগে পরে বিশ্বখ্যাত প্রাক্তন জার্মান অধিনায়ক কার্লহেইঞ্জ রুমেনিগে, জিনিয়াস ফরোয়ার্ড গার্ড মুলার, গত বিশ্বকাপের সেরা তারকা উরুগুয়ের দিয়োগো ফোরলান এসে কলকাতার মাঠ ও দর্শকদের মাতিয়ে দিয়ে গেছেন। আর্জেন্টিনা ও ভেনিজুয়েলা ম্যাচ তার থেকে ব্যতিক্রমী কিছু নয়।

সি এম জি কর্তারা এ ধরনের ম্যাচের আয়োজন করে এদেশের মানুষকে আধুনিক বিশ্ব ফুটবলের মূলস্রোতের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন এই পর্যন্ত। আর এই ম্যাচকে কেন্দ্র করে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের কিছুটা সংস্কার হয়েছে। স্টেডিয়ামের ভিতরে-বাইরে রঙ হয়েছে, বসার চেয়ারগুলিতে পালিশ আনা হচ্ছে। মিডিয়া বক্স, বাথরুম, লাউঞ্জ, কনফারেন্স রুম, ড্রেসিংরুম সব ক্ষেত্রে আধুনিকতার একটা পরশ পাওয়া যাচ্ছে। এতবড় একটা স্টেডিয়াম অথচ সুভাষ চক্রবর্তী তথা বামফ্রন্ট সরকারের হাতে পড়ে তার দফারফা হয়ে গেছে। সমাজবিরোধী কাজকর্ম থেকে বেআইনি ব্যবসা-বাণিজ্য কি না হয়নি বিগত বছরগুলিতে। আন্তর্জাতিক ম্যাচ শেষ কবে হয়েছে তা কেউ মনে করতে পারবে না। শেষ আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্স মিট হয়েছে সেই ১৯৮৯ সালে। অথচ আধুনিক ক্রীড়া কমপ্লেক্স বলতে যা বোঝায় তাই ছিল গর্বের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। পরলোক থেকে দুই দ্বিচারী রাজনীতিক জ্যোতি বসু ও সুভাষ চক্রবর্তীর আত্মা সব দেখছেন যে এতদিনে যুবভারতী তার হারানো স্থূলতা ও মর্যাদা ফিরে পাচ্ছে।

তবে বহিরঙ্গে যতই পরিমার্জন হোক, দর্শকরা যতই বিশ্বমানের ফুটবল দেখুক, মূল ব্যাপার এই ম্যাচ থেকে ভারতীয় ফুটবলের কি লাভ হবে? একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এই ম্যাচ শুধুমাত্র একটা চমকের জন্ম দেওয়ার কাজ ছাড়া বেশি কিছু নয়। ১৬ বছর হয়ে গেল এখনও জাতীয় লিগ পেশাদার হলো না। জাতীয় লিগে খেলা ক্লাবগুলোর বাণিজ্যিক বিপণন কর্মসূচি নেওয়া হলো না। কোনো ক্লাবেই আধুনিক পরিকাঠামো ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নেই। সামান্য হলেও ব্যতিক্রম গোয়ার ক্লাবগুলি, যেহেতু তারা অফিস ক্লাব। কিন্তু কলকাতার ক্লাবগুলোর কি অবস্থা। বেসিক ব্যাপার হলো মাঠ, তার অবস্থা কহতব্য নয়। গ্যালারি সব মান্ধাতার আমলের। ড্রেসিংরুম থেকে মাল্টিজিম সব কিছুতেই ছন্নছাড়াভাব। কর্পোরেট কালচার গড়ে উঠল না বিদেশের মতো। আর যে দেশের জাতীয় দল বছরে এক আধটা টুর্নামেন্ট খেলে, আর মাসের পর মাস শুধু ট্রেনিং করে, সে দেশের ভবিষ্যৎ ফুটবলাররা কি দেখে নিজেদের আধুনিক ফুটবলের মূলস্রোতে নিয়ে আসবে। ফেডারেশন এখন ধনী সংস্থা। নিজস্ব ভবন হয়েছে দিল্লিতে। ফিফা ও একাধিক শিল্প সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছে। কিন্তু দেশ জুড়ে উন্নত ফুটবল পরিবেশ ও আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারল না। জাতীয় সিনিয়র ও জুনিয়ার দলের মান উন্নয়নের জন্য চিন্তা ভাবনা ও পরিকল্পনাও নেই। তাই ক্লাব ফুটবল থেকে জাতীয় দল সবকিছুই চলছে অপেশাদারিত্বের মোড়কে। আর্জেন্টিনার ম্যাচ কেন এখানে বিশ্ব একাদশ বনাম বিশ্বচাম্পিয়ন স্পেন খেললেও অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

শব্দরূপ-৫৯৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

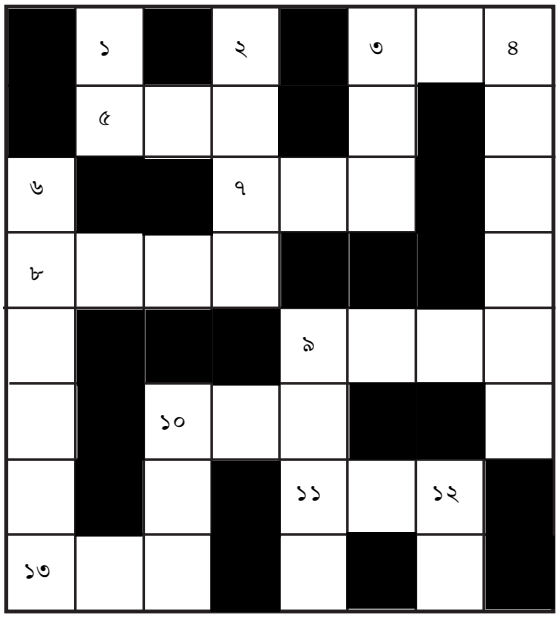

সূত্র :

পাশাপাশি ঃ ১. জমির পরিমাপ, **৫.** ডোবা, বিল; আগাগোড়া মাংস, **৭.** গুরুগোবিন্দের অনুবর্তী শিখ-সম্প্রদায়, **৮.** গণেশ, প্রথম দু'য়ে ভাং (মাদক দ্রব্য), **৯.** এই শৈল শহরে রবীন্দ্রনাথ প্রথম 'জন্মদিন' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন, **১০.** প্রচুর, দেদার, **১১.** যে লৌহপীঠের ওপর ধাতু পেটা হয়, **১৩.** চোর।

উপর-নীচ ঃ ১. পাণ্ডব-কৌরবদের অস্ত্রগুরু, **২.** নতুন বছরের হিসাবের খাতা, **৩.** সঙ্গীতাদির সহিত আনন্দসম্মিলন, **৪.** নির্বিকার সমদর্শী যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী, **৬.** শয্যায় দুইজনের মধ্যে উন্মুক্ত অসি রাখিয়া যুবক যুবতীর জিতেন্দ্রিয়তা রক্ষণ, **৯.** রাবণের মামা, হনুমানকে না মারিয়াই মনে মনে নিজের পুরস্কারস্বরূপ লঙ্কাভাগ করিয়াছিল, **১০.** সরল; কৃষ্ণের পিতৃব্য, **১২.** সূর্য (অগ্রহায়ণে পূজা হয়)।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৯৩
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	প্রা	য়ো	প	বে	শ	ন
অ	ন্ত্য	জ	■	■	■	ব	■
প্স	■	ন	হু	ষ	■	সা	■
রা	কা	■	■	ষ্ঠী	■	ধ	■
■	র	■	গা	■	■	না	গা
■	ণ	■	ব	ড়	বা	■	ণ্ডী
■	বা	■	■	■	র	বা	ব
অ	রি	ষ্ট	ল	ক্ষ	ণ	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৯৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ২০

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
5 September - 2011

দাম : ৫.০০ টাকা